ধীরেন্দ্র লাল ধরের

গল্প বলি গল্প শোন

॥ সূচী ॥

॥ গোয়েন্দা কাহিনী :

দশ লাখ টাকা—১

সন্ধানী—২৪

॥ অলৌকিক কাহিনী :

জটাধারী—৫০

মারণমন্ত্র—৬২

শিল্পী—৭১

॥ ভৌতিক কাহিনী :

বুকের গুলি—৮৪

গুম্‌টি ঘরের লোকটি—৯৪

এক রাত্রি—১০২

ফিরে পেতে চায়—১০৯

নতুন বাড়ী—১১৭

দশ লাখ টাকা

এটর্নী বীরেন বসু আলোক রায়কে ডেকে বললেন—আপনার কাকা রাঘবেন্দ্র রায় যে উইল করে গেছেন, তাতে সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি আপনাকে দান করে গেছেন। সে সম্পত্তির মূল্য প্রায় দশ লাখ টাকা,—কলিকাতায় তিনখানি বাড়ী এবং নগদে প্রায় লক্ষ টাকা।

আলোক বিস্মিত হোল, জিজ্ঞাসা করলো—কেন কাকার ছেলেকে কাকা কিছু দিলেন না?

—অমিয় রায় ইচ্ছা করলে একটি ফ্ল্যাটে বিনা ভাড়ায় সারা জীবন বাস করতে পারে, আর কিছু না।

—কাকাবাবু ছেলেকে একেবারে বঞ্চিত করে গেলেন?

—ছেলে তো তাঁর অনুগত ছিল না। তারপর কয়েকটা বদ্ কাজ করার পর থেকে ছেলের তিনি মুখ দেখতেন না। তবে আপনি ইচ্ছা করলে তাকে কিছু দিতে পারেন।

—তার পৈতৃক সম্পত্তি, তার তো কিছু পাওয়া উচিত।

—সে আপনার সদিচ্ছা। তবে আমি যেটুকু শুনেছি তাতে অমিয়বাবু কিছু পেলেও রাখতে পারবেন না। রাঘবেন্দ্র বাবু আমাকে বার বার সে কথা বলে গেছেন। তবে আপনার ক্ষেত্রেও তিনি একটি সর্ত দিয়ে গেছেন,—এই উইলের সম্পত্তি অধিকার করার পূর্বেই আপনাকে চাকরী ছেড়ে ব্যবসা করতে হবে, এবং সেই ব্যবসায়ে অন্ততঃ পাঁচজন মাইনে করা কর্মচারী থাকা চাই। তিন মাস আপনাকে সময় দেওয়া হয়েছে। সেই সময়ের মধ্যে আপনাকে বিবাহ করতে হবে।

আলোক বললো—ব্যবসা আমি কালই সুরু করে দিতে পারি, কিন্তু বিয়ের কথা তো বলা কঠিন।

—এই দুটি সর্ত, যদি আপনি না পালন করতে পারেন,

তাহলে আপনি একটি পয়সাও পাবেন না। স্থাবর সম্পত্তি যাবে রামকৃষ্ণ মিশনে এবং নগদ টাকা সব পাবে অমিয় রায়। রাঘবেন্দ্র রায় মারা গেছেন এক মাস দশ দিন হোল, আর এক মাস কুড়ি দিন আপনার সময় আছে। ইতিমধ্যে ছুটি সর্ত পূরণ করে আপনি আমাকে জানাবেন, আদালত থেকে উইলের অধিকার সাব্যস্ত করতে হবে।

এটর্নী কথা শেষ করলেন। আলোক নমস্কার করে বেরিয়ে এল।

দেড়শো টাকা মাইনের কেরাণীর দশ লাখ টাকার সম্পত্তি লাভ। কাকার সম্পত্তি পাওয়া আলোকের পক্ষে অপ্রত্যাশিত। কাকা ব্যবসায়ের ব্যাপারে দীর্ঘকাল কলিকাতার বাইরেই ছিলেন, বছর তিনেক আগে পূজার সময় কলিকাতায় এসে তিনি হোটেলে ছিলেন, সেই সময় আলোক গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিল, সেই তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা। অমিয়র সম্পর্কে সেই সময় থেকেই তিনি মনোকষ্টে ছিলেন।

যাক সে কথা। কালই অফিসে গিয়ে সে পদত্যাগ-পত্র লিখে দেবে। দশটি বছর নির্বিবাদে সে দশটা-পাঁচটা অবিশ্রান্ত খেটেছে, ভাল কাজের লোক বলে সুনাম আছে, কিন্তু যখনি উচ্চপদ শূন্য হয়েছে তখনই অফিসাররা নিজের লোককে সেখানে বসিয়েছে, আলোকের কথা ভাবে নি। আলোকের মুরুব্বি নেই, আলোক তোষামোদ করতে পারে না, সেইজন্য দশ বছরেও আলোকের মাইনে দেড়শো টাকার উপরে ওঠেনি।

চাকরী ছেড়ে সে নিজের কারবার করবে, ধনীদের মত কারবার সে করবে না। যারা তার কারবারে কাজ করবে তারা লাভের অংশ পাবে, কারবার চলবে সবাইকার সমবায়ে, সমস্বার্থে। সে দেখিয়ে দেবে অর্থনীতিতে এম-এ পাস করা বিদ্যা প্রত্যক্ষ জীবনে কাজে লাগানো যায় কি না। তবে হ্যাঁ, অমিয়দা'কে সে বঞ্চিত করবে না।

আলোক ভাবছে আর পথ চলেছে। চল্‌তে চল্‌তে কোন

এক সময় তার খেয়াল হোল যে একজন তরুণী অনেকখানি পথ তার সঙ্গে সঙ্গে আসছে, মাঝে মাঝে পিছন পানে তাকাচ্ছে।

আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ের কাছে পথটা বেশ নিরিবিলি ও জনবিরল। সেখানে এসেই মেয়েটি একেবারে আলোকের পাশে এসে পড়লো। আলোকের পানে ফিরে বললো—আপনি আমাকে একটু সাহায্য করবেন?

আলোক চম্‌কে উঠলো।

মেয়েটি বললো—আমাকে একটি গুণ্ডা ধর্মতলা থেকে অনুসরণ করছে, আপনি আমাকে বাড়ী অবধি পৌঁছে দেবেন?

আলোক পিছন পানে তাকিয়ে দেখলো, সত্যই একটি লোক পিছনে আসছে। আলোকের ব্যায়াম-পুষ্ট দেহের মাংসপেশীগুলি কঠিন হয়ে উঠলো, বললো—কোন ভয় নেই, চলুন, আমি যাচ্ছি।

—ধন্যবাদ—বলে মেয়েটি আলোকের পাশে পাশে চলতে সুরু করলো।

শিয়ালদহের রেলের পুল পার হয়ে বেলেঘাটা। দু'পাশে অসংখ্য বস্তী। আগে এখানে মুসলমানদের বাস ছিল, এখন পূর্ববঙ্গের মানুষ ভীড় করেছে। বস্তীর মাঝে মাঝে দু-একখানি দোতলা বাড়ী মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটি একটি বস্তীর মধ্যে এসে ঢুকলো। সঙ্কীর্ণ গলি, জল প্যাচ্‌ প্যাচ্‌ করছে। আলোক কখনো তেমন পথে চলেনি।

সেই গলি শেষ করে আরেক গলি। সেই গলির শেষ প্রান্তে একটি দোতলা বাড়ী। মেয়েটি সেই বাড়ীর দরজায় এসে থামলো, বললো—এই আমাদের বাড়ী।

আলোক বললো—বেশ, তাহলে আমি যাই।

—সে কি, আপনি ভিতরে আসুন, এক কাপ চা খেয়ে যান।

—না না। আমি আর ভিতরে যাব না।

—তাহলে আমি বড় দুঃখিত হব, আপনি ভিতরে আসুন।

এমন ভাবে কথাগুলি বললে, যে আলোক আর এড়াতে পারলো

না, সে ভিতরে গেল। মেয়েটি তাকে বরাবর দোতলায় নিয়ে এসে একটি ঘরে বসালো। বললো—বসুন, আমি চা নিয়ে আসি, আপনি ততক্ষণ এই কাগজখানি পড়ুন,—

একখানি ইংরাজী মাসিক পত্রিকা সে আলোককে দিয়ে গেল।

আলোক পত্রিকাখানির ছবি দেখতে লাগলো।

দরজার দিকে পিছন ফিরে আলোক বসেছিল। সহসা কট্ করে আলোটা নিভে গেল। কি হোল বুঝবার আগেই একখানি চাদর তার মাথার উপর এসে পড়লো। পরক্ষণেই কয়েকজন লোক তাকে বেশ জোরেই চেপে ধরলো। সে চীৎকার করতে চাইল, একজন তার মুখ টিপে ধরলো। গায়ে তার শক্তি ছিল, কিন্তু চোখে কিছু দেখতে পায় না, একসঙ্গে এতগুলি লোকের অতর্কিত আক্রমণে সে পেরে উঠবে কেন?

ক্ষিপ্রহস্তে সেই চাদরের উপর দিয়েই লোকগুলি তার মুখ বেঁধে ফেললো, হাত-পা বাঁধলো, তারপর তাকে তুলে নিয়ে চললো—কোথায় কে জানে।

লালবাজারে নিরুদ্দিষ্ট লোকের খোঁজখবর নেবার জন্য নূতন আপিস বসেছে, একজন মহিলা পুলিশ সেখানে বসে ছিলেন। দুপুরবেলা এক বিধবা মহিলা ঢুকলেন তাঁর ঘরে, বললেন—মা, এটাই কি নিরুদ্দিষ্টদের সন্ধান করার আপিস?

—হ্যাঁ।

মহিলা বললেন—আমার ভাই গত সোমবার আপিসে গেছে, কিন্তু তারপর আর বাড়ী আসে নি।

—আপনি হাসপাতালে খবর নিয়েছেন?

—মেডিক্যাল কলেজ, আর-জি-কর, নীলরতন, এই তিনটি হাসপাতালে খোঁজ নিয়েছি।

—এই ক'দিন সে তাহলে আপিসেও যায় নি?

—না।

এবার মহিলা পুলিশ খাতা পেনসিল নিয়ে বসলেন, বললেন —বেশ, আমরা খোঁজ করবো। আপনি সব বলুন দিকি। নাম ?

—শ্রীআলোক রায়।

—বয়স ?

—চৌত্রিশ বছর।

—দেহের কোন বিশেষত্ব আছে ?

—কপালের ডান দিকে একটি কাটার দাগ আছে।

—গায়ের রং ?

—শ্যামবর্ণ।

—লম্বা কি রকম ?

—ঠিক বলতে পারি না, তবে বেঁটে নয়।

—রোগা কি মোটা ?

—রোগাও নয়, মোটাও নয়, ব্যায়াম করা চেহারা।

—স্বভাব চরিত্র ?

—অতি সৎ, নস্যি নেওয়া ছাড়া আর কোন নেশা নেই। চা'ও সব সময় খায় না।

—আপনি তাঁর কে হন ?

—দিদি।

—আপনার ঠিকানা ?

—দশ নম্বর মুকুরচাঁদ সরখেল লেন।

ইউনিফর্ম-পরা একজন ইনেস্‌পেক্‌টার কি একটা দরকারে ঘরে এসেছিলেন, এতক্ষণ তিনি একপাশে বসেছিলেন, এবার তিনি দিদির মুখের পানে তাকিয়ে বললেন—এতক্ষণ আমি আপনার কথা শুনছিলাম, আপনি আমায় চিনতে পারেন ? আমি জীবন রায়, আলোকের সঙ্গে একসঙ্গে চার বছর পড়েছি, আপনার বাড়ীতেও অনেকবার গেছি।

ইনেস্‌পেক্‌টার টুপি খুললেন, দিদি এবার তাঁকে চিনলেন—

চিনতে পেরেছি ভাই। তুমি যখন এখানেই কাজ কর, তখন যে করেই হোক্ আলোকের একটু সন্ধান করে দেখ ভাই। আমার ওই ভাইটি ছাড়া আর কেউ নেই।

দিদি কেঁদে ফেললেন।

জীবনবাবু বললেন—আপনি ক'দিন একটু ধৈর্য ধরুন, আমাদের একটু সময় দিন, আমাদের দিক থেকে যা করবার তার কোন ত্রুটি হবে না।

—তুমি নিজে ভাই একটু চেষ্টা কর।

—আমিই করবো।

—আমি তাহলে কবে এসে খবর নোব ?

—আপনার আর এখানে আসতে হবে না, আমিই আপনার বাড়ী যাব।

বড়কর্তাকে বলে জীবন রায় কেসটি গ্রহণ করলো।

জীবন প্রথমে খবর নিল আলোকের আপিসে। সেখানকার সহকর্মীরা কিছুই বলতে পারলো না।

জীবন এলো আলোকের বাড়ীতে, দিদিকে বললো—আলোকের কোন চিঠিপত্র, ডায়েরী কিছু আছে, থাকলে সেগুলো আমি একবার দেখতে চাই।

দিদি ভিতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে জীবনকে বসালেন, বললেন—এইটেই আলোকের ঘর, তোমার যা মন চায় দেখতে পার।

ঘরের একটি সেল্‌ফের উপর যত দেশী ও বিদেশী দর্শন শাস্ত্রের বই,—উপনিষদ্ থেকে মার্কসবাদ পর্যন্ত কিছুই বাদ নেই। একখানি তক্তাপোষের উপর বিছানা পাতা আছে, পাশে একটি ছোট টেবিল, টেবিলের উপর একটি ছোট ল্যাম্প। আর দেয়ালে বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী ও সুভাষবাবুর চারখানি বড় ছবি। ঘরে আর কোথাও কিছু নেই।

জীবন টেবিলের ড্রয়ারটি টানতে ভিতরে একখানি খাম পাওয়া গেল। খামখানির উপর এটর্নী 'বসু ও রায়ের' নাম ছাপা। ভিতরে কোন চিঠি নেই। জীবন বললো—এটর্নী আপিস থেকে আপনার ভাইয়ের নামে চিঠি এসেছিল কেন ?

—আমার কাকা মারা গেছেন, তাঁর এটর্নী আলোককে একবার দেখা করবার জন্য লিখেছিল।

—আলোক কি সেখানে গিয়েছিল ?

—তা তো জানি না।

—কবে যাবার কথা ছিল কিছু জানেন ?

—না, তা'ও বলতে পারি না।

—কাকার এটর্নী আলোককে চিঠি লিখেছিল কি সম্পর্কে কিছু জানেন ?

—না। তেমন কিছু হলে আলোক নিশ্চয়ই আমাকে বলতো।

—আপনার কাকা তো খুব বড় লোক বলে শুনেছি।

—হ্যাঁ।

—কাকার কে আছে ?

—এক ছেলে আছে, অমিয়। সেই সব পাবে।

—অমিয়বাবুর ঠিকানা কি ?

—টালিগঞ্জের ওদিকে কোথায় যেন সে থাকে, আলোক তার ঠিকানা জানে।

—আপনার কাকার বাড়ীতে সে থাকে না ?

—না, সে সিনেমার কাজ করে। ওদিকে সব সিনেমা কোম্পানি আছে, তার কাজের সুবিধা হয়।

—আপনাদের আর কোন আত্মীয় আছে ?

—না।

জীবন বললো—আচ্ছা, এই খামখানা আমার কাছে থাক্, আমি এখানে একবার সন্ধান করে দেখি।

ওল্ড্ পোস্টাপিস স্ট্রীট। সারি সারি শুধু এটর্নী অফিস।

জীবন এলো 'বসু ও রায় কোম্পানি'র আপিসে। এটর্নী বীরেন বসুর সঙ্গে জীবন সাক্ষাৎ করে অনেক খবর পেল। সোমবার আপিস ফেরত আলোক গিয়েছিল তাঁর আপিসে। কাকা রাঘবেন্দ্র রায় তাঁকেই সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে গেছেন। নিজের ছেলে অমিয় রায়কে তিনি ত্যাজ্য করে গেছেন। উইলের তিন মাসের সর্তও বীরেনবাবু জীবনকে বললেন।

জীবন সব শুনলো। তার সন্দেহ গিয়ে পড়লো অমিয় রায়ের উপর। কিন্তু অমিয় রায়ের ঠিকানা বীরেনবাবু জীবনকে বলতে পারলেন না।

তবে সিনেমা লাইনের লোককে খুঁজে পেতে জীবনের দেরী হোল না। টালিগঞ্জ থানায় গিয়ে সিনেমা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল একজন সহকর্মীকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বললো—অমিয় রায়ের খবর জানি না? ঢাকুরিয়ায় কোথায় যেন থাকে। আমি আজই আপনাকে ঠিকানা এনে দেব।

সেই দিনেই জীবন অমিয় রায়ের ঠিকানা পেল। পরদিন সকালেই জীবন গেল অমিয় রায়ের সঙ্গে দেখা করতে।

—অমিয়বাবু আছেন? আমি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—আমিই অমিয়বাবু, বলুন কি বলবেন?

—আপনার জ্যাঠতুতো ভাই আলোক রায় সম্পর্কে আপনি কোন খবর রাখেন?

—আলোক? না, আলোক সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।

—আলোকবাবু আপনার বাবার সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছে, সে কথা আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন?

—শুনেছি। কেন?

—আমার ধারণা, যে আপনার পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হোল তার নিরুদ্দেশ হওয়ার সঙ্গে আপনার কোন একটা সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক।

—এই ধারণা হবার কারণ ?

—টাকা-পয়সার ব্যাপার কিনা, তাই সন্দেহটা আপনার উপর এসে পড়ে।

—আপনার ধারণা নিয়ে আপনি থাকুন, আমার কাজ আছে।

—আমার এইটাই কাজ। আমরা ডিটেকটিভ্ ডিপার্টমেণ্টের লোক।

—ওঃ, আপনি পুলিশের লোক, তাই জানা নেই শোনা নেই সকাল বেলায় লোকের দরজা ঠেঙ্গিয়ে জ্বালাতন করতে এসেছেন ? আপনি এখন বিদায় হোন্, আমার অন্য কাজ আছে।

অমিয়বাবু জীবনের মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেলেন।

ডিটেকটিভ্ ডিপার্টমেণ্টের লোক বলে পরিচয় দেবার মধ্যে জীবনের একটা উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় কিনা দেখবার জন্য জীবন তখনই ঢাকুরিয়া থেকে ফিরলো না। কিছুদূরে গাড়ীখানি রেখে এসেছিল, গাড়ীতে এসে বসে রইল।

মিনিট পঁচিশ বাদেই পথের মোড়ে অমিয় রায়কে দেখা গেল, সে বাস-স্টপের কাছে এসে দাঁড়ালো। বাস আসতেই তাতে উঠে পড়লো। জীবনের মোটরও চলতে সুরু করলো বাসের পিছু পিছু।

অমিয় যদি পিছনে তাকিয়ে সাবধান হয়ে যায়, সেই আশঙ্কা করে সে পকেট থেকে একজোড়া নকল গোঁফ বের করে নাকের নীচে ফিট করে নিলে, চোখে নীলাভ এক জোড়া চশমা পরলো।

বাস ও মোটর একই সঙ্গে ছুটলো।

স্টেটবাসের দৌড় শেষ হলো হাওড়ায়। অমিয় নেমে বালির বাসে উঠে বসলো। জীবন ছুটলো তার পিছনে।

লিলুয়ার শেষ প্রান্তে বাস থেকে অমিয় নামলো।

সামনেই একটি মাঠ। মাঠ পার হয়েই পাঁচিল ঘেরা দোতলা একখানি বাড়ী। সেই বাড়ীর মধ্যে অমিয় অদৃশ্য হলো।

জীবন এবার মোটর থেকে নামলো। বাড়ীখানা একবার ভালো

করে দেখে নিলে। তারপর কাছাকাছি চায়ের দোকানে গিয়ে খোঁজ করলো—মশাই, বলতে পারেন মাঠের ধারে ঐ পাঁচিল ঘেরা দোতলা বাড়ীটা কার ?

—ওঃ, ওই পাগলা গারদের কথা বলছেন ? বিলাত ফেরত এক ডাক্তার এখানে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসালয় খুলেছে।

—কোন সাইনবোর্ড তো দেন নি ?

—এই তো সেদিন সুরু হয়েছে মশাই। আগে রোগী আসুক, টাকা আসুক, তবে তো সব হবে।

—কত দিন সুরু হয়েছে ?

—তিন-চার মাস হবে।

—ডাক্তারবাবুর নাম কি ?

—ডাক্তার রবিন বাসু, এম-বি, এম. আর-সি-পি, মন-ব্যাধি-বিশারদ।

ধন্যবাদ জানিয়ে জীবন সেখান থেকে বিদায় নিলে।

পাগলা গারদের ফটকের পাশেই দারোয়ান বসেছিল। জীবন জিজ্ঞাসা করলো—ডাক্তারবাবু আছেন ?

—আছেন। গিয়ে কি বলবো ?

—আমি বলবো, আমাকে নিয়ে চল।

—ভিতরে একজন লোক আছে। তিনি না বেরুলে তো আর একজনের যাবার হুকুম নেই।

—বেশ, গিয়ে বলগে পুলিশের ইনসপেক্টার এসেছেন, লাল-বাজার থেকে।

দারোয়ান চমকে উঠলো, তারপরেই ভিতরে ছুটলো, জীবনও তার পিছনে চললো। বারান্দায় উঠে প্রথম ঘরখানির ভিতর ঢুকে দারোয়ান জানালো—পুলিশের দারোগা সাহেব এসেছে।

—পুলিশের দারোগা এসেছে ?—(অমিয়ের গলা)—বলে দাও এখন ডাক্তারবাবু রোগী নিয়ে ব্যস্ত আছেন, দেখা হবে না।

জীবন দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলো, বললো—পুলিশ যখন কোন

সরকারী কাজে আসে, তখন কারও অনুমতির অপেক্ষা রাখে না অমিয়বাবু।

ডাক্তারবাবু ও অমিয় দু'জনেই চমকে উঠলো।

জীবন বললো—আমি একটা কথা আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাই, অমিয় রায়ের সঙ্গে এই পাগলা গারদের সম্পর্ক কি?

অমিয় বললো—আপনি পুলিশের লোক বলে কি আপনার কাছে সব ব্যাপারের জবাবদিহি করতে হবে নাকি?

—শুধু জবাবদিহি করা নয়, আপনার কথায় যদি বিশ্বাস না হয় তা হলে নিজ দায়িত্বে আমি আপনাকে ও ডাক্তারবাবুকে গ্রেপ্তার করতে পারি।

—পুলিশ বিনা অপরাধে……

—বিনা অপরাধে নয়, অপরাধ আপনার আছে।

ডাক্তার সাহেব এবার অমিয়কে বাধা দিয়ে বললো—অমিয়বাবুর একটি রোগী আছে এখানে সেই সূত্রে উনি এখানে এসেছেন।

—সেই রোগী হচ্ছে অমিয়বাবুর জাঠ্‌তুতো ভাই, আলোক রায়। সুস্থ-সবল মানুষ। দশ লাখ টাকা পৈত্রিক সম্পত্তির জন্য তাকে এখানে বেআইনীভাবে আটকে রাখা হয়েছে।

ডাক্তারবাবু বললো—এ আপনি কি বলছেন, বেআইনীভাবে এখানে লোককে আমি আটকে রাখব কেন? যারা এখানে আছে প্রত্যেকেই মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত।

জীবন বললো—আপনিই তাদের রুগ্ন বলে এখানে ভর্তি করেছেন।

—আলোক রায়ের ক্ষেত্রে তা হয়নি। এখানে ভর্তি হওয়ার আগে কলিকাতায় কোন বিখ্যাত মন-ব্যাধির চিকিৎসক তাকে পরীক্ষা করেছেন।

—সেই সার্টিফিকেট আমি দেখতে চাই।

—স্বচ্ছন্দে।

ডাক্তার বাবু একটা ফাইল এগিয়ে দিলেন জীবনের সামনে। ফাইল খুলতেই সবার উপরে পাওয়া গেল আলোক রায়ের নাম।

পাঁচদিন আগে কলিকাতায় কোন এক নামকরা ডাক্তার আলোক রায়কে দেখে মানসিক বিকারগ্রস্ত বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন।

ডাক্তারবাবু বললো—দেখছেন কার সার্টিফিকেট দেখে আলোক রায়কে আমি এখানে ভর্তি করেছি?

জীবন বললো,—দেখলাম। কিন্তু একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, এখানে আলোক রায়কে ভর্তি করেছে কে?

—অমিয় বাবু।

—এই ডাক্তারকে দেখানোর ফী দিয়েছে কে? এখানকার খরচই বা জোগাবে কে?

—ডাক্তারের ফী কে দিয়েছেন জানি না, তবে এখানকার খরচ দিয়েছেন অমিয়বাবু।

—আলোক রায়ের ব্যাপারে এতো যত্ন নেবার কারণ কি অমিয়-বাবু? বিনা স্বার্থে এতটা টাকা আপনি খরচ করছেন কেন? আর তাছাড়া পাঁচদিন ধরে আপনি এতো ব্যাপার করলেন আর তার বাড়ীতে একটা খবর দিতে পারলেন না?

অমিয় বললো,—আমি সময় করে উঠতে পারিনি।

—দরকার থাকলে সকাল আটটার সময় ঢাকুরিয়া থেকে লিলুয়ার পাগলা-গারদে ছুটে আসা যায়, কিন্তু পাঁচ দিনের মধ্যে ঢাকুরিয়া থেকে শ্যামবাজার যাওয়া যায় না। যাক সে কথা, আমি একবার আলোকের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—চলুন, তাকে দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন।

ডাক্তারবাবু জীবনকে বারান্দার শেষ প্রান্তে একটি ঘরে নিয়ে গেল। দরজা বাইরে থেকে বন্ধ ছিল। দরজা খুলে ডাক্তার ভিতরে ঢুকলো, জীবনও ঢুকলো। প্রশস্ত ঘর। একপাশে একটি জানালার ধারে আলোক চুপ করে বসে ছিল। ময়লা জামা-কাপড়, মুখে একমুখ দাড়ি। খানিকটা পাগলের মতই দেখাচ্ছে।

জীবন বললো—কি আলোক, আমায় চিনতে পার? আমি জীবন রায়।

আলোক খানিকক্ষণ জীবনের মুখের পানে তাকিয়ে রইল তারপর হতাশ ভাবে বললো—তুমিও এদের দলে ?

—আমি কারও দলে নই। আমি লালবাজার থেকে তোমার খোঁজ নেবার জন্যে আসছি।

—সত্যি ? আমাকে তাহলে এখান থেকে বের করে নিয়ে চল। এরা জোর করে আমাকে এখানে রেখেছে, বলে 'তুমি পাগল।'

—একজন বড় ডাক্তার তো তোমাকে পাগল বলেই সার্টিফিকেট দিয়েছেন।

—বড় ডাক্তার আমাকে পাগল বলেছে ? বড় ডাক্তার আমাকে দেখলো কখন্ তাতো জানি না। আমি তো অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম, যখন জ্ঞান হলো তখন দেখি যে এই ঘরে পড়ে আছি, তারপর থেকেই এরা আমাকে বলছে যে 'তুমি পাগল।'

ডাক্তারবাবু বললো—শুনলেন তো ? যখন পাগলামি দেখা দেয়, তখন এঁর জ্ঞান থাকে না। এই সকালের দিকটায় ইনি ভাল থাকেন, তারপর যত বেলা বাড়বে, রোদ বাড়বে, ততো মাথা গরম হতে থাকবে, সন্ধ্যাবেলা আর কোন জ্ঞান থাকবে না।

আলোক বললো—আমি অমিয়দাকে বলেছি, টাকা-পয়সা আমার দরকার নেই। বাপের টাকা সেই ভোগ করুক। আমায় শুধু এখান থেকে ছেড়ে দিক। আমি যেমন চাকরী করে খাচ্ছি তেমনি খাব।

—তোমার কোন ভয় নেই, আমি তোমায় একজন সিভিল সার্জেন দিয়ে দেখাব।

ডাক্তারবাবু বললো—সেই ভালো কথা। যে কোনো দিন সন্ধ্যাবেলা আপনি ডাক্তার নিয়ে আসুন, তিনি দেখুন। তা'হলেই আপনি সত্যি-মিথ্যে বুঝতে পারবেন। আপনি নিজে এসেও সন্ধ্যাবেলা দেখতে পারেন। আমি দশ বছর পাগলের চিকিৎসা করছি, সকালবেলা সব পাগলই একটু ভাল থাকে। আরও তিনটি পাগল তো আমার এখানে রয়েছে, তাদেরও দেখবেন চলুন।

—না, আর কাউকে দেখার আমার দরকার নেই।

জীবন ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

অমিয় চুপ করে বসেছিল, আসার সময় জীবন বলে এলো—আচ্ছা অমিয়বাবু, চললাম, আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে।

অমিয়ের মুখখানি কুঞ্চিত হয়ে উঠলো।

সন্ধ্যাবেলা একখানি মোটর এসে দাঁড়ালো ডাক্তার রবীন বাসুর পাগলা-গারদের সামনে। ড্রাইভার দারোয়ানের হাতে একখানি চিঠি দিল, বললো—ডাক্তারবাবুকে দাও।

ডাক্তারবাবু অফিস-ঘরেই ছিল, চিঠি পড়েই চঞ্চল হয়ে উঠলো, অমিয় লিখেছে :

ডাক্তারবাবু, অবিলম্বে আপনার একবার এখানে আসা প্রয়োজন, বিশেষ কথা আছে। কোন কারণে আমি নিজে যেতে পারলাম না। গাড়ী পাঠালাম, আপনি এখনি একবার আসুন—ইতি অমিয়।

ডাক্তারবাবু তখনই সেই মোটরেই বেরিয়ে পড়লো।

একটা প্রকাণ্ড বাগান বাড়ীর দরজার সামনে এসে মোটর থামলো। ড্রাইভার বললো,—বাবু ভিতরে আছেন, আপনি যান, আমি মোটরটা ঘুরিয়ে নিই।

ডাক্তার নামলো। হুস্ করে মোটর আবার বেরিয়ে চলে গেল।

মোটরখানি দৃষ্টির বাইরে চলে যেতেই ডাক্তার খানিকটা হতচকিত হয়ে গেল, তারপর কি ভেবে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লো। অন্ধকার বাগান। ভিতরে কিছুটা গিয়ে একখানি ছোট বাড়ী। চাবি দেওয়া, কেউ কোথাও নেই। ডাক্তার কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কি করবে ভেবে পেলে না।

বাড়ী থেকে বের হয়ে এসে পথের উপর খানিকক্ষণ দাঁড়াল। তারপর ধীরে ধীরে হাঁটতে সুরু করল। যে পথ দিয়ে এসেছিল, সেই পথে।

ডাক্তারবাবু যখন বাসের আশায় পথ হাঁটছিল তখন হাওড়ায় পাগলা গারদের মধ্যে আর এক দৃশ্য অভিনীত হচ্ছিল।

সন্ধ্যাবেলা অন্ধকার জমাট বাঁধতেই পাগলা-গারদের সামনে এলো ইনেস্‌পেক্টার জীবন রায়। মাঠের মাঝে পাগলা-গারদের বাড়ীখানি তখন স্তব্ধ থম্‌থম্ করছে। জীবন একবার চারিপাশ ঘুরে দেখলো, তারপর পিছনের পাঁচিল টপ্‌কে ভিতরে নেমে পড়লো।

বাড়ীখানি নিঝুম, অন্ধকার, শুধু ফটকের সামনে একটি মাত্র আলো জ্বলছিল, তারই পাশে দারোয়ান একখানি খাটিয়া পেতে শুয়েছিল। হয়তো লাফিয়ে নামার সময় জীবনের একটু-আধটু শব্দ হয়েছিল কিন্তু দারোয়ানের সেদিকে কোন খেয়াল ছিল না।

পায়ে পায়ে জীবন ফাঁকা মাঠটুকু পার হয়ে বাড়ীর বারান্দায় এসে উঠলো। সন্তর্পণে কয়েকখানি ঘর পার হয়ে আলোকের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। পকেট থেকে এক গোছা চাবি বের করে একটির পর একটি পরীক্ষা করতে করতে শেষে দরজার তালাটি খুলে ফেললো। তারপর ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজাটি ভিতর থেকে ভেজিয়ে দিলে। এবার টর্চের আলোয় জীবন দেখলো মেঝের উপর মাদুরে পড়ে আলোক ঘুমুচ্ছে। ধীরে ধীরে তার কপালে হাত দিয়ে জীবন ডাকলো—আলোক! আলোক!

আলোক চমকে উঠলো। ধড়মড় করে উঠে বসলো, বললো—কে?

—আস্তে কথা বল। আমি জীবন।

—কে জীবন? জীবনকে আমি চিনি না।

জীবন দেখলে আলোকের চোখ দুটি লাল। কেমন যেন একটা বিভ্রান্ত দৃষ্টি। বললো—আমি জীবন, তোমার সহপাঠী, পুলিশের ইনেসপেক্টার জীবন।

—আমি তোমাকে চিনি না। আমার ঘুম পেয়েছে, আমি ঘুমুবো।

আলোক আবার শুয়ে পড়লো।

জীবন হতাশভাবে ঘরের চারিপাশে একবার তাকালো। এক কোণে একটি কুঁজো ও একটি মাটির গ্লাস ছিল। জীবন এক গ্লাস জল এনে বললো—খাও।

জীবন এবার কুঁজোর জল আলোকের মাথায় ঢালতে সুরু করলো। আলোক স্থাণুর মত শুয়ে রইল, কোন প্রতিবাদ করলো না। বেশ কিছুক্ষণ চাপ্‌ড়ে চাপ্‌ড়ে জীবন আলোকের মাথায় জল দিলে। তারপর ডাকলো—আলোক।

—কী?

—আমায় চিনতে পারছ? আমি জীবন।

—কে জীবন?

—তোমার সহপাঠী পুলিশের ইনেসপেক্টার জীবন রায়।

—জীবন রায়·· জীবন রায়! আলোক কয়েকবার মন্ত্রোচ্চারণের মত বিড় বিড় করলো। তারপর বললো,—না, তোমাকে আমি চিনি না।

জীবন একটু ধাঁধায় পড়লো। সকালবেলা যে লোকটি তাকে অত সহজে চিনলো, বিকালবেলা তার এমন ভাবান্তর কেন? জীবন কিছুক্ষণ চুপ করে বসে ভাবলো। তারপর বললো—আলোক, এটা একটা পাগলা গারদ তুমি জান?

—পাগলা গারদ? পাগলা গারদ কেন?

—এরা তোমাকে পাগল সাজিয়ে পাগলা গারদে রেখে দিয়েছে, যাতে তুমি তোমার কাকার সম্পত্তি দশলাখ টাকা না পেতে পার।

আলোক চুপ করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল, তারপর বললো —আমাকে পাগল সাজিয়েছে, না? বুঝেছি, টাকার জন্য আমাকে পাগল সাজিয়েছে, না?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। সেইজন্য তোমাকে এখান থেকে পালাতে হবে। এখান থেকে পালালেই তুমি সেরে যাবে।

—এখান থেকে পালাতে হবে, না?

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সহসা আলোক ধড়মড় করে উঠে বসলো, বললো— ঠিক কথা, আমাকে এখান থেকে পালাতে হবে, আমি পালাবো।

—আস্তে কথা বল। চেঁচামেচি নয়। ওরা বাইরে আছে। আমাদেরকে লুকিয়ে সরে পড়তে হবে।

—ওরা বাইরে আছে? তাহলে তো পালাতে পারবো না। ধরে ফেলবে।

—কোন ভয় নেই, আমি যাচ্ছি, চুপি চুপি আমার সঙ্গে এসো, পিছন দিকের পাঁচিল টপ্‌কে আমরা পালাবো। বাইরে মোটর আছে।

আলোকের হাত ধরে জীবন নিঃশব্দে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো।

বারান্দার পাশ দিয়ে গাছের ছায়ার আড়াল দিয়ে অন্ধকারে জীবন এসে দাঁড়ালো পাঁচিলের পাশে। তারপর জীবন বললো—আলোক, তুমি আগে পাঁচিলের উপর উঠে দাঁড়াও। আমার হাতের উপর একটা পা রাখ, তারপর আমার কাঁধের উপর উঠে, পাঁচিলের উপর উঠে পড়ো।

আলোক বললো—অতটা উঁচুতে আমি কি উঠতে পারবো?

—ঠিক পারবে, না পারো আমি তো আছি।

আলোক উঠতে যাচ্ছে সহসা ওদিকে বারান্দা থেকে সাড়া উঠলো—কৌন্ হ্যায় রে?

একজন দরোয়ান ছুটে এলো এদিকে, দু'জনকে পাঁচিলের নীচে দেখতে পেয়ে সে হাঁক দিলে—আরে পাগলা ভাগ্‌তা হ্যায়, পাকড়ো, পাকড়ো—

আলোক তখন পাঁচিলের উপর উঠে পড়েছে। একজন দরোয়ান ছুটে এসে আলোকের পা ধরে তাকে পাঁচিলের উপর থেকে টেনে নামিয়ে আনলো, ফেলে দিল মাটিতে। আরেকজন জীবনকে জাপ্‌টে ধরলো, জীবন তৎক্ষণাৎ এক ঘুসি বসিয়ে দিলে তার মুখে। প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে দরোয়ান সেইখানেই ধরাশায়ী হলো। পড়ে গিয়েই সে কিন্তু তখনই আবার উঠে দাঁড়ালো। এবার জীবন মাথা দিয়ে তার পেটে মারলো এক ঢুঁ। এবার সে আর্তনাদ করে সেইখানেই বসে পড়লো।

জীবন এবার আলোকের পানে ফিরলো। দারোয়ানটা আলোকের বুকের উপর উঠে বসেছে। জীবন তার চোয়ালের উপর এক ঘুসি মারলো, সে ঘুরে পড়ে গেল। জীবন আলোকের হাত ধরে টেনে তুললো, বললো,—উঠে এসো এদিকে—

পাঁচিলের পাশে সে আরো সরে এলো, বললো—তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি আগে উঠে যাই, তারপর তোমাকে তুলে নেবো।

পাঁচিল ধরে হাতে ভর দিয়ে জীবন পাঁচিলের উপর উঠে পড়লো। তারপরেই আলোকের দুটি হাত ধরে পাঁচিলের উপর টেনে তুলছে, এমন সময় একজন দরোয়ান এসে আলোকের পা দু'খানি ধরে ঝুলে পড়লো। দু'জনের ভর জীবন সইতে পারলো না। বাধ্য হয়ে আলোককে ছেড়ে দিলে, তারপর পকেট থেকে রিভলভার বের করে বললে—হটাও, কাছে এলে গুলি চালাবো।

দরোয়ান কিন্তু তখন আলোককে জড়িয়ে ধরেছে। জীবনের মনে হলো গুলি চালায়, কিন্তু আলোককে লাগতে পারে ভেবে সে গুলি করতে পারলো না।

ওদিকে আরেকজন দরোয়ানও তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। সে সাড়া তুললো—ওরে রঘুয়া, হরিয়া, পাগলা ভাগ্‌তা হ্যায়।

—হুড়মুড় করে আরো লোকের ছুটে আসার শব্দ হলো. জীবন বুঝলো তার চেষ্টা ব্যর্থ হলো। আলোককে উদ্ধার করা গেল না। জীবন আর অপেক্ষা করতে পারলো না, পাঁচিল থেকে বাইরে লাফিয়ে পড়লো।

অতি প্রত্যূষেই টেলিফোনের শব্দে জীবনের ঘুম ভেঙে গেল। হাওড়া থানা থেকে টেলিফোন করছে।

ডাক্তার রবীন বাসু, মনোব্যাধির চিকিৎসক এখনই এসে ডায়েরী করে গেলেন যে কাল রাত্রে তাঁর চিকিৎসালয় থেকে আলোক রায় নামে এক উন্মাদ পালিয়ে গেছে।

জীবন জিজ্ঞাসা করলে—সারারাত আশ্রমের উপর আপনারা নজর রেখেছিলেন ?

—হ্যাঁ, পুর্ণ হালদার নামে একজন স্পেশ্যাল কনস্টেবলকে সারা রাত ওখানে পাহারায় রেখেছিলাম।

—সে কি বলে ?

—সে বলে রাত সাড়ে দশটার সময় একখানি প্রাইভেট গাড়ীতে ডাক্তার আশ্রমে ফিরে আসে, তারপর কাল সকাল পর্যন্ত আশ্রম থেকে কেউই বেরোয় নি। রাত্রে আশ্রমে কোন গোলযোগ সে শোনে নি।

জীবন বললো—বেশ, আপনি আশ্রমের উপর নজর রাখুন, আমি যাচ্ছি।

মিনিট পনেরোর মধ্যে মোটর নিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো।

পাগলা গারদের খানিকটা দূরে এক পাগল ভিখারী এক গাছ তলায় বসে বিড় বিড় করছিল। জীবন তাকে জিজ্ঞাসা করলো—পূর্ণ, নতুন কোনো খবর আছে ?

ভিখারী তার মুখের পানে তাকালো, তার মোটরের কাছে উঠে এসে বললো—আছে। এই একটু আগে একখানি মোটরে দুটি বোরখা পরা মুসলমান মেয়ে এসেছে, তারা ভিতরে আছে।

বোরখা পরা মুসলমান মেয়ে ? জীবন চুপ করে কি যেন ভাবলো তারপর মোটরখানি একটু দূরে নিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে বোরখা পরা মেয়ে দুটিকে নিয়ে মোটর বেরুলো। জীবনের মোটরও ছুটলো তাদের পিছনে।

দীর্ঘ পথ পার হয়ে মোটরখানি এলো টালিগঞ্জের এক স্টুডিওতে। স্টুডিওর ফটক তখন বন্ধ ছিল। অমিয় মোটর থেকে নেমে দরোয়ানকে ডেকে দরজা খোলালো। তারপর বরাবর মোটর নিয়ে ঢুকে গেল ভিতরে। তাদের পিছনে স্টুডিওর ফটক আবার বন্ধ হয়ে গেল। জীবন বরাবর গিয়ে দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করলো—কৌন্ আয়া হ্যায় ভাই ?

—ডিরেক্টর অমিয়বাবু, বহুৎ ভারি আদ্‌মি।

—উনকো সাথ ওই জানানালোগ, কৌন হ্যায় ?

—কোই এক্‌ট্রেস হোগী।

—এক্‌ট্রেস বোর্খা পিনকে আয়া ?

—বাবুজী, ইয়ে তো আজব জায়গা হ্যায়, কোই কভি রাজা বন্‌তা, কোই ভিখারী বন্‌তা, কোই বোর্খাভি পিনতা, হর কিসিমী হামলোগ হরেক সাজ দেখতে হেঁ। কেঁও বাবুজী ? আপকো কোই জরুরৎ হ্যায় ?

—ম্যায় উনকো সাথ এক দফে মুলাকাৎ করনে মাংতা।

—ঠিক হ্যায় বাবুজী, ন' বাজে আপিস খুলে গা, উস্‌ বখৎ আইয়ে।

—উস বখৎ তো ভীড় হোগা ভাই, আভি অমিয়বাবু একেলা হ্যায় না ?

—কেয়া করেগা বাবুজী, আভি বাহারকে আদ্‌মি ঘুসনা মানা হ্যায়। হামারা নোকরি চলা যায় গা।

কাজেই ন'টা পর্যন্ত অপেক্ষা করাই জীবন স্থির করলো।

সকাল ন'টা নাগাদ স্টুডিওর ফটক খোলা হলো। একে একে লোকজন আসতে লাগলো। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে একদল লোকের সঙ্গে জীবনও ভিতরে ঢুকে পড়লো।

স্টুডিও তো প্রকাণ্ড একটি বাগান বাড়ী। প্রথমেই আফিস ঘর, তারপর বাগান। বাগানে এদিক ওদিক ছড়ানো ছোট ছোট অনেক বাড়ী। সান-বাঁধানো পুকুর। তাছাড়া স্যুটিং-এর জন্য সাউণ্ড-প্রুফ একখানি বিরাট ঘর। সেখানে নকল বাড়ী-ঘর তৈরী করে স্যুটিং করা হয়। সর্বত্রই মানুষের যাতায়াতে জনবহুল হয়ে উঠেছে। সেই লোকজনের মাঝে সবদিকে দৃষ্টি রেখে জীবন একে একে ঘরগুলি অতিক্রম করে একেবারে বাগানের মাঝে এসে

পড়লো। বাগানটি পরিষ্কার। একটি গাছের নীচে বসে এখানে কোথায় কি করা সম্ভব সে তাই ভাবতে লাগলো।

হঠাৎ তার চোখে পড়লো অমিয় একাকী হাতে কি একটা নিয়ে বরাবর বাগানের ভিতর দিয়ে চলেছে। স্টুডিওর শেষ প্রান্তে একটি পুরানো দোতলা বাড়ী। সেই বাড়ীর মধ্যে গিয়ে ঢুকলো অমিয়। তারপর প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে খালি হাতে বেরিয়ে এলো সেখান থেকে।

জীবন আরো কিছুক্ষণ সেখানে বসে রইল। তারপর ধীরে ধীরে সে চললো সেই বাড়ীর দিকে। ছোট দোতলা বাড়ী, গুদাম ঘরের মত। দরজায় একটি বড় তালা লাগানো আছে। জীবন পকেট থেকে এক গোছা চাবি বের করে খানিকটা চেষ্টা করে তালাটি খুলে ফেললো। ভিতরটা প্রায় অন্ধকার, ভ্যাপসা গন্ধ। জীবন খানিকক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে রইল। তারপর চোখে ঠিকমত ঠাহর হলে সে দেখলো ঘরের মধ্যে একপাশে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করা আছে। সেইখানে একজন লোক পড়ে আছে। জীবন কাছে গিয়ে ভালো করে দেখলো, লোকটি আর কেউ নয়, আলোক রায়। আলোক ঘুমুচ্ছে কি না ঠিক বোঝা গেল না, জীবন একটু নাড়াচাড়া দিয়ে ডাকলো—আলোক!

আলোক কোন সাড়া দিলে না।

জীবন বরাবর এলো টালিগঞ্জ থানায়। চার জন সাদা-পোশাকী পুলিশ ও একখানি গাড়ী নিয়ে আবার সে বেরুলো।

গাড়ী বাইরে রেখে পাঁচজন স্টুডিওতে ঢুকে বাগানের মধ্যে অপেক্ষা করতে লাগলো। দিনের বেলা স্টুডিওর মধ্যে অমন বাইরের কত লোক আসে, কেউ তাদের প্রশ্নই করলো না।

সাউণ্ড-প্রুফ ঘরের ভিতর কি একখানি বইয়ের স্যুটিং চলছিল। সন্ধ্যা নাগাদ স্যুটিং শেষ হলো। অমিয়বাবু 'ফ্লোর' থেকে বেরুলো,

হন হন করে সে গিয়ে উঠলো সেই পুরানো বাড়ীতে, চাবি খুলে আলোকের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। ঠিক সেই সময় জীবনও ঢুকলো সেই ঘরে। ঝনাৎ করে একটি জানালা খুলে ফেললো। অমিয় চমকে উঠলো, বললো—কে ?

—আমি পুলিশ, তোমাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছি।

চারজন পুলিশ অমিয়কে ঘিরে ধরলো।

জীবন বললো—আপনার ভাইকে পাগল সাজিয়ে পাগলা গারদে রাখা, এবং পরে পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে তাকে এখানে আটক করার জন্য আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করলাম।

—পাগলকে আবার পাগল সাজিয়ে রাখতে হয় নাকি ?

—সে পাগল নয়। তাকে আপনারা সিদ্ধি মেশানো জল খাওয়াতেন, তার ঘরের কুঁজোর জল আমি পরীক্ষা করেছি, তাতে সিদ্ধি পাওয়া গেছে। তাছাড়া যদি সে সত্যই পাগল হয় তাকে পাগলা গারদ থেকে বোর্খা পরিয়ে সরিয়ে এনে এখানে আটকে রাখলেন কেন ? আপনাকে আমার গোড়া থেকেই সন্দেহ হয়েছিল, শুধু হাতে-নাতে ধরার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এখন আর প্রমাণের অভাব হবে না।

—আপনার কাছে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে ?

—কি আছে না আছে সে কৈফিয়ৎ আমি আপনাকে দোব না। ভালভাবে গাড়ীতে উঠবেন তো চলুন, নইলে হাতে হাতকড়া লাগিয়ে নিয়ে যাব।

অমিয় আর কথা বললো না, সুড়সুড় করে বেরিয়ে পড়লো।

আদালতে অমিয়র ষড়যন্ত্র প্রমাণিত হলো। সে পিতার সম্পত্তির জন্য ডাক্তার রবীন বাসুর সঙ্গে যোগসাজস করেছিল।

ডাক্তারের ডিগ্রি কেড়ে নেওয়া হলো।

অমিয়র দু'বছর জেল হলো।

কিন্তু যে মেয়েটি আলোককে বেলেঘাটার বাড়ীতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল তাকে বের করা গেল না।

আলোকের কুঁজোর জলে প্রতিদিন সিদ্ধি মেশানো হতো। এইভাবে আর কিছুদিন সিদ্ধি খেলে আলোকের সত্যই মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটতো। পুরা একটি মাস লাগলো তার সম্পূর্ণ সুস্থ হতে।

আলোক হেসে একদিন দিদিকে বললো—দশ লাখ টাকার সম্পত্তি পেতে হলে কিছু কষ্ট তো করতেই হয়।

সন্ধানী

সকালবেলা খবরের কাগজে চোখ পড়তেই সুধীর চমকে উঠলো, প্রথম পৃষ্ঠার নীচের দিকে বড় অক্ষরে একটি শিরোনামা ছাপা হয়েছে:

শিল্পাশ্রমের পরিচালিকার রহস্যজনক মৃত্যু—

আত্মহত্যা বলিয়া সন্দেহ।

সংক্ষিপ্ত সংবাদ, সুধীরের পড়ে ফেলতে এক মিনিটও লাগলো না।—

বেহালা শিল্পাশ্রমের সম্পাদিকা সুষমা সেন সারাদিন যথারীতি কাজকর্ম শেষ করে রাত্রে নিজের নির্দিষ্ট ঘরে শুতে যান। পরদিন সকালে তাঁর ঘুম থেকে উঠতে দেরী দেখে জনৈক পরিচারিকা তাঁকে ডাকাডাকি করে কিন্তু কোন সাড়া না পেয়ে শেষে ভয় পেয়ে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখে তিনি মৃতাবস্থায় শয্যায় পড়ে আছেন। দেহে কোন আঘাতের চিহ্ন নাই। শয্যার পাশেই টিপয়ের উপর একটি গেলাস দেখা যায়। পুলিশ সন্দেহ করে যে তিনি বিষপান করে আত্মহত্যা করেছেন। আত্মহত্যার কারণ নির্ণয় করার জন্য পুলিশ তদন্ত করছে। এ পর্যন্ত কাকেও গ্রেপ্তার করা হয়নি।

সুধীর খবরটার পানে তাকিয়ে চুপ করে খানিকক্ষণ বসে রইল।

সুধীর শিল্পাশ্রমের সহকারী সভাপতি। অক্লান্তভাবে বছর খানেক পরিশ্রম করে সে এই আশ্রমটি গড়ে তোলে।

পাকিস্তান হবার পর দলে দলে মানুষ আসতে সুরু করলো, ছড়িয়ে পড়লো দমদম থেকে টালিগঞ্জ অবধি। বেহালার পরিত্যক্ত কয়েকটা বাগান দখল করে বসে গেল একদল নিঃস্ব মানুষ। মুলি বাঁশের ছাউনির উপর টালির ছাদ দিয়ে কোনোমতে মাথা গুঁজবার ঠাঁই করলো। কিন্তু থাকার চেয়েও খাওয়ার তাগিদ বড়। শত শত মানুষ কাজকর্মের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। দশ-বারো বছর বয়স

থেকে ষাট বছর বয়স অবধি সবাই কাজ চায়। মেয়ে ও পুরুষ কেউ বাদ নেই। এতো কাজ কে দেবে? প্রায় আশী-নব্বই লাখ নিঃস্ব মানুষের অন্নসংস্থান করে দেবার সুষ্ঠু ব্যবস্থা এদেশে নেই। অনাহারে ও স্বল্পাহারে মানুষগুলো কুঁকড়ে উঠতে লাগলো। ভিখারীতে পথঘাট ছেয়ে গেল। কিন্তু সে জন্য ধনীর মোটর ছুটানোর কোন সংকোচ হলো না।

বছর সাত-আটের একটি ছোট মেয়ের হাত ধরে এক রমণী আসতো প্রতিদিন সুধীরের দরজায়, সুধীর তাদেরকে প্রতিদিন চারটি করে পয়সা দিত, মুড়ি খাবার জন্য। দু-তিন দিন তারা এলো না। তারপর একদিন মেয়েটি একা এলো, কাঁদতে কাঁদতে বললো—বাবু, আমার মা মরে গেছে।

—আর কে আছে?

—কেউ নেই।

—থাকিস কার কাছে?

মেয়েটা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল, ভদ্রঘরের মেয়ে, ধুলি-ধুসর দেহের মধ্যেও মধ্যবিত্তের বুদ্ধিদীপ্ত একটা ছাপ আছে মুখে।

সুধীর বললো—খাস্ কোথায়?

—পয়সা দাও, মুড়ি খাব।

এই সাত-আট বছরের মেয়েটিকে কেন্দ্র করে সুধীরের কর্মচক্র সেইদিন থেকে চলতে সুরু করলো। শিক্ষিত মানুষ একা হলেও যদি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে তো অনেক কিছু করতে পারে। সুধীরও একান্ত চেষ্টায় এই শিল্পাশ্রম প্রতিষ্ঠা করলো। ছোট ছোট মেয়েরা এখানে থাকবে,খাবে, লেখাপড়া ও হাতের কাজ শিখবে। এই কাজে তার প্রধান সহায়িকা হলেন সুষমা সেন, এম-এ পাস করা এক ধনী বিধবা। নিজের বাড়ীখানি তিনি লাগিয়ে দিলেন এই কাজে। একমাত্র কন্যা মোটর চাপা পড়ার পর থেকে তিনি শান্তি খুঁজছিলেন, এই কাজের মধ্যে তিনি শান্তির অবলম্বন পেলেন। এই ধরনের আশ্রম চালাবার মত বিদ্যা ও অর্থ তাঁর ছিল, কোন ব্যাপারেই তিনি

পরের মুখের পানে তাকিয়ে থাকতেন না। বাইরে থেকে সাহায্য আসুক আর না-আসুক তাঁর পরিকল্পনা তিনি কার্যকরী করতেন। এজন্য সকলেই তাঁর কাজের প্রশংসা করতো।

মাত্র পঞ্চাশটি মেয়ে নিয়ে শিল্পাশ্রম চলছিল। এই অঞ্চলের বাসিন্দা অনাথ ছেলেমেয়ের সংখ্যা হিসাবে এই প্রতিষ্ঠান মোটেই পর্যাপ্ত নয়, কথা উঠেছিল এই বৈশাখ মাস থেকে এইটে দ্বিগুণ করা হবে। সেই সম্পর্কেই আয়োজন চলছিল, এমন সময় সুষমা সেনের আত্মহত্যা বিস্ময়কর। তাঁর আত্মহত্যার কোন সঙ্গত কারণ সুধীর ভেবে পেল না।

তবে কি হত্যা? কিন্তু সুষমাকে হত্যা করে কেউ তো লাভবান হবে না। টাকা-পয়সা বাড়ীঘর সবই তো সে আশ্রমে দিয়ে দিয়েছে। তাহলে?

জামাটা গায়ে চড়িয়ে সুধীরবাবু তখনই বেরিয়ে পড়লেন শিল্পাশ্রমের উদ্দেশ্যে।

পথে কমলের সঙ্গে দেখা। বললো—কাল আপনাকে তিনবার টেলিফোন করেছি, রাত দশটাতেও আপনি বাড়ী ফেরেননি।

কমল শিল্পাশ্রমের সম্পাদক। কলেজে অধ্যাপনা করে, সপ্তাহে আঠারোটি মাত্র ক্লাস, বাকি সময়টা আশ্রমের জন্য কাজ করে। এই ধরনের কাজেই তার আনন্দ।

—কাল একটা মামলায় সারাদিন চুঁচুড়া কোর্টে ছিলাম। সেখান থেকে থানাপুলিশ শেষ করে শেষ ট্রেনে ফিরেছি।

—খুনের মামলা তো?

—হ্যাঁ।

—খুন ছাড়া তো আপনি আর কোন মামলা করেন না। তাই শেষ অবধি খুন আপনারই ঘরে এসে পড়েছে।

—মানে, তুমি কি বলতে চাও সুষমা খুন হয়েছে?—সুধীর সোজা প্রশ্ন করলো।

—আমার সন্দেহ তাই। আত্মহত্যা করার কোন কারণ নেই। যে মানুষ সন্ধ্যাবেলা আমার সঙ্গে মেয়েদের কম্পোজিটারি শেখানোর পরিকল্পনা করেছেন, রাত্রে তিনি আত্মহত্যা করলেন? এ নিছক খুন। কে খুন করলো আর কেন খুন করলো আমি শুধু সেইটাই ভাবছি।

—কারণ ছাড়া কার্য হয় না, যেখানে কোন লাভ নেই সেখানে একজন মানুষ আর একজন মানুষকে খুন করবে কেন?

—সেই লাভের ব্যাপারটা কি, সেইটাই আমি চিন্তা করছি।

—হত্যার কোন সূত্র পেয়েছ?

—সূত্র কিছু পাওয়া যায়নি বলেই তো পুলিশ আত্মহত্যা বলে অনুমান করছে।

—সে তো কাগজে পড়লাম। তুমি যে হত্যা বলে সিদ্ধান্ত করেছ তার ভিত্তি কি?

—ভিত্তি ঘটেছে এক সন্দেহ থেকে। পরন্তু শিবানীর উপর দিয়ে দুটো একসিডেন্ট গেছে, যে দুটোকে সাধারণের চোখে একসিডেন্ট বলে মনে হলেও আমার সন্দেহ, তা হত্যার চেষ্টা।

শিবানী কমলের স্ত্রী। কমল হিন্দু মহাসভার একজন নিঃস্বার্থ কর্মী। বছর খানেক আগে কয়েকজন মুসলমান গুণ্ডা হিন্দু সেজে শিবানীদের বাড়ীর নীচের তলে ভাড়া থাকে। তারপর একদিন সুযোগ বুঝে শিবানীকে নিয়ে উধাও হয়। কয়েকস্থানে তাকে লুকিয়ে রাখে, কিন্তু পুলিশের তৎপরতায় এক সপ্তাহের মধ্যে শিবানী তাদের কবল থেকে রক্ষা পায়। মামলা চলে একবছর, হিন্দু ব্যারিস্টার মুসলমান গুণ্ডার পক্ষ নিয়ে শিবানীকে অপহরণকারীর পত্নী বলেই সাব্যস্ত করতে চান। কিন্তু শেষ অবধি কমলের একান্ত চেষ্টায় গুণ্ডাটির ছ'বছর জেল হয়। তখন শিবানীকে নিয়ে জাগে সমস্যা, মুসলমানের ঘর থেকে এসেছে, এ মেয়েকে ঘরে তুললে অন্যান্য বোনগুলোর তো বিবাহ হবে না। শিবানী তাহলে যায় কোথায়? কমল বললে—কুছ পরোয়া নেই, ওকে আমি বিয়ে করবো।

শিবানী আই-এ পাস, বর্তমানে বি-এ পড়ে আর শিল্পাশ্রমের মেয়েদেরকে সেলাই ও পশমের কাজ শেখায়।

কমল বললো—সন্ধ্যার পর শিল্পাশ্রম থেকে ফিরছে এমন সময় একখানি মোটর প্রায় তার ঘাড়ের উপর এসে পড়ে। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে একটা গাছের আড়ালে সে দাঁড়িয়ে পড়েছিল বলে রক্ষা পায়। অতখানি চওড়া রায় বাহাদুর রোডের উপর অমন ভাবে গাড়ী এসে পড়ার কোন কারণ নেই, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়া। তারপর বাড়ী আসছে, এমন সময় পাশের বাড়ীর ছাদ থেকে একটা ফুলগাছের টব তার মাথায় পড়ে। পেনের কালি কিনবে বলে সে পিছু ফিরেছিল বলেই রক্ষা, নাহলে যদি সে সোজা আর এক পা এগোয় তাহলে টবটা মাথায় এসে পড়ে। দুটো ঘটনাই একটা হত্যার চেষ্টা বলে আমার মনে হয়। সুষমা সেনের এই আকস্মিক মৃত্যু আমার সেই সন্দেহ দৃঢ় করেছে।

সুধীরবাবুর মুখে চিন্তার রেখা পড়লো, বললো—দুটি মেয়েছেলেকে হত্যা করে কার কি স্বার্থ পূরণ হবে। সুষমা সেনের টাকা-পয়সা দানপত্র করা হয়ে গেছে, আর শিবানীর তো সেদিক থেকে কিছুই নেই, তাহলে?

কমল হাসলো, বললো—জটিল ব্যাপার যদি দু'মিনিটেই সমাধান হয়ে গেল, তাহলে জটিলতা কিসের? তবে সুষমা-দির মৃত্যুর অন্তরালে যে একটা রহস্য আছে এ সম্পর্কে বেশী চিন্তার কিছু নেই। একটু ভাবলে আপনার মনেও এই সন্দেহ হবে।

সুধীরবাবু কোন কথা বললেন না। নীরবে এগিয়ে চললেন। পথের সীমায় আশ্রম-বাড়ীটা তখন দেখা যাচ্ছে।

শিল্পাশ্রমে সুষমা সেনের মৃত্যুর পর সবচেয়ে বেশী দায়িত্ব এসে পড়লো কমলের উপর, এবং কমল তৎক্ষণাৎ পরোক্ষে সেই দায়িত্ব অর্পণ করলো শিবানীর উপর। সারাদিনের বেশির ভাগ

সময়ই শিবানী এখানে কাটাতো, তার পক্ষে এই কাজটা কোন গুরুভার হয়ে দেখা দিল না। তবে সুষমাদি থাকতে কোন দায়িত্ব ছিল না। এখন সব দায়িত্বটুকুই চাপলো মাথার উপর। একজনকে তো সবকিছু দেখতেই হবে। আর রীতিমত মাইনে দিয়ে সুপারিনটেনডেণ্ট রাখার মতো সামর্থ্য প্রতিষ্ঠানটির এখনও হয় নি। প্রতিষ্ঠানটিকে যারা হাতে করে গড়েছে, তাদেরই একজনকে বিনা বেতনে কাজ করে যেতে হবে। স্বামীর প্রতিষ্ঠান, কাজেই শিবানীকে কিছু শ্রমদান করতেই হবে।

সুষমাদি'র মৃত্যুর দিন থেকে শিবানীকে থাকতে হলো আশ্রমে। এই কাজে পরিশ্রম আছে সত্যি, কিন্তু তার মধ্যে কিছুটা আনন্দও পেতো শিবানী। কমল বলেছিল—এইবার বোঝা যাবে তুমি কেমন কাজের লোক।

—আমাকে তাহলে এখানেই থাকতে হবে।

—থাকবে।

—তাহলে ওদিকে তোমার ব্যবস্থা কি হবে? খাওয়া-দাওয়া?

—কিসের কি হবে, তুমি যখন ছিলে না তখন কি আমার দিন কাটতো না?

—বেশ তো, ক'দিন যাক, তখনই বোঝা যাবে।—বলে শিবানী মুচ্‌কে হাসে।

তা শিবানী হাসলেও কমল যে জীবনের প্রথম কয়েকটা বছর একান্ত এককভাবে কাটিয়েছে, একথা ঠিক। মায়ের মৃত্যুর পর বাবা দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। সৎমায়ের ব্যবহার ভালো নয়। বাবা অন্যায় দেখলেও মুখে কোন কথা বলতেন না। দুর্ব্যবহার ক্রমে চরমে উঠলো, ইস্কুল ফাইন্যাল পাস করার পর কলিকাতায় কলেজে পড়ার নাম করে কমল সেই যে বাড়ী ছাড়লো, আর কখনো বাড়ীমুখো হয় নি। টিউসনির উপর ভরসা রেখে মেসে থেকেছে। সকাল-সন্ধ্যায় টুইসনি করেছে। দুপুরে কলেজে গেছে। অবসর সময় বসে বসে পড়েছে, কারও সঙ্গে মেলামেশার

সুযোগ পায়নি। পরীক্ষার ফল ভালো হয়েছে, অধ্যাপকের সুপারিশে চাকরি জুটিয়েছে। তারপর কলেজেরই অধ্যক্ষ তাকে ভিড়িয়েছে হিন্দু মহাসভার কাজে। যত কিছু মানুষের সঙ্গে মেলামেশা তো সবই তারপর থেকে। এবং সেই মেলামেশার যোগাযোগেই এই শিল্পাশ্রম।

সুধীরবাবুকে সঙ্গে নিয়ে কমল এলো শিল্পাশ্রমে। আপিস ঘরে শিবানী বসেছিল। কাল সকাল থেকে এই ঘরে শুধু পুলিশের জেরা ও তদন্ত চলেছিল, আজ একেবারে নিরিবিলি। সুষমা সেনের মৃত্যুর শোকাবহ বিষণ্ণতা ঘরখানিকে স্তব্ধ করে রেখেছে।

কমল আসতেই শিবানী বললো—একটু আগেই তোমার মা এসেছিল।

—কার মা?—কমল প্রশ্ন করলো।

—কেন, তোমার মা। আমার শাশুড়ী।

—আমার তো মা নেই।

—আহা, তোমার সৎমা গো!

—আমার সৎমা এসেছিল? তুমি তাকে চিনলে কি করে?

—তিনি পরিচয় দিলেন।

—তাঁর সঙ্গে তো দশ বছর আমার কোন সম্পর্ক নেই, একখানা চিঠি লিখেও কখনও সংবাদ নেন না, তিনি হঠাৎ একেবারে এখানে এসে হাজির হলেন যে?

—বললেন, এই অঞ্চলেই এসেছিলেন ডাক্তার দেখাতে, যাবার সময় একবার দেখে যাচ্ছেন আশ্রম। খবরের কাগজে পড়েছেন এই আশ্রমের কথা, শুনেছেন যে তাঁর ছেলে এর মধ্যে আছে, অনেকদিন দেখার ইচ্ছা ছিল, তা ছেলে তো কোন সম্পর্ক রাখে না, তিনি নিজেই এলেন।

—ছেলে সম্পর্ক রাখে না!—কমলের মুখে হাসি ফুটে উঠলো, বললো—কখন এসেছিলেন?

—এসেছিলেন সাতটায়। পরিচয় পাবার পর আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সব দেখালাম, তোমার অনেক সুখ্যাতি করলেন, চলে গেলেন আটটার সময়। বললাম—'আর একটু থেকে ছেলের সঙ্গে দেখা করে যান?' বললেন—'আর একদিন আসবো। এখনি একবার হাসপাতালে যাব, সেখান থেকে বাড়ী ফিরবো।'

—শ্যাওড়াফুলি থেকে সকাল সাতটার আগে বেহালায় চলে এলেন, এবং দশ বছর বাদে আমার খোঁজখবর নিতে এলেন, আবার বলে গেলেন 'আবার আসবো'। এর ভিতরে কোন উদ্দেশ্য আছে। হয় কোন ছেলেমেয়ের পড়াশুনা, বা চাকরী বা টাকা—একটা কিছু প্রয়োজন, তাই আমাকে মনে পড়েছে। যাক্, ওসব নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার কিছু নেই, যখন আসবে তখন দেখা যাবে, তবে মনে রেখো মানুষটি কিন্তু সরল নয়। সাজিয়ে গুছিয়ে অনেক মিছে কথা বলতে পারে।

—আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি, আসবে তো তোমার কাছে। —বলে শিবানী উঠে পড়লো। কমল ও সুধীর মুখোমুখি বসলো আশ্রম পরিচালনা সম্পর্কে যথাবিহিত আলোচনা করতে।

শিবানী বললো—আমি আপনাদের জন্য দু- কাপ চায়ের ব্যবস্থা করি গে—

শিবানী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এক দরজা দিয়ে আর আরেক দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো অনিল দত্ত।

অনিল দত্ত সি-আই-ডি ইনেসপেক্টার। সুধীরবাবুর সহপাঠী।

—যাক, তোমাদের দু'জনকেই পেয়ে গেছি, আমি ভাগ্যবান— বলে অনিল একখানি চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লো। কমলের মুখের পানে তাকিয়ে বললো—আপনি আমায় চেনেন না, সুধীরের কাছ থেকে পরিচয়টুকু জেনে নেবেন। বেশী সময় এখন আমার হাতে নেই, আমি শুধু একটা প্রশ্ন জেনে যেতে চাই।

—মিসেস্ সেনের কেস্‌টা কি শেষ অবধি তোমার উপরেই পড়লো নাকি ?—সুধীর প্রশ্ন করলো।

—না। সে কথা উঠবে করোনারের বিচারের পর। এখন আমি অন্য ব্যাপারে এসেছি। একটা কমলবাবুকে ব্যক্তিগত প্রশ্ন, সৌজন্যবোধে অপরিচিতকে সরাসরি এই প্রশ্ন করা চলে না, কিন্তু পুলিশের লোকদের সৌজন্যতা ও ভদ্রতার বালাই রাখতে নেই, ওসব থাকলে ভালো পুলিশ হওয়া যায় না।

কমল এবার বুঝতে পারলো যে আগন্তুক পুলিশের লোক।

অনিল বললো—কমলবাবু, আপনার স্ত্রীর পুরো নাম কি ?—শ্রীমতী শিবানী দত্ত, বর্তমানে মিসেস শিবানী রায়, তাই না ?

—হ্যাঁ।

—মিসেস্ রায়ের বাবার নাম শম্ভুনাথ দত্ত ?

—হ্যাঁ।

—মিসেসের মা জীবিত ?

—তিনি ওঁর শৈশবেই মারা গেছেন। শিবানী সৎমায়ের কাছেই মানুষ।

—আচ্ছা, মিসেস রায় কোথায় জন্মেছিলেন ? কলিকাতায় না কলিকাতার বাইরে ?

—তা তো আমার জানা নেই।

—সেইটা জানা আমার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। সেইটে জানতে পারলে আমার কাজ খানিকটা এগিয়ে যাবে।

—ভিতরে গেছে চা আনতে, এখনি আসবে, আপনি ওঁকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিন্।

সুধীর প্রশ্ন তুললো—তুমি শিবানীর ব্যাপারে অতো জিজ্ঞাসু হয়ে উঠলে কেন ? ওকে নিয়ে আবার কি গোলযোগ দেখা দিল ?

—গোলযোগ একটা দেখা দিয়েছে, আমি তার জট খুলতে চাইছি—অনিল বললো—সেইজন্যই ওর পরিচয়টা আমার দরকার।

—মেয়েটিতো ভালো লেখাপড়া করে, আশ্রমের কাজ করে, কোন গোলমালের মধ্যে থাকার মত মেয়ে তো নয়।

—সে কোন গোলমালে না গেলেও, তার চারিপাশে গোলমাল গজিয়ে উঠতে তো কোন বাধা নেই।

—ব্যাপারটা কি খুলেই বল না, আমি তোমাকে হয়তো কিছুটা সাহায্য করতে পারি।

—সাহায্যের দরকার হবে না। আমিই আর দু-চার দিনের মধ্যে ব্যাপারটা ফয়সালা করে ফেলবো। তখন তোমাকে সব কথা বলবো, আজ নয়।

একটা চুরুট ধরিয়ে অনিল টানতে সুরু করলো।

ইতিমধ্যে শিবানী ঘরে এলো, সঙ্গে একটি চায়ের ট্রে নিয়ে এলো। সুধীর ও কমলের সামনে দুটি কাপ নামিয়ে দিয়ে শিবানী অনিলকে বললো—দাঁড়ান, আপনার জন্য চা নিয়ে আসি।

অনিল বললো—থাক, আমি চা খেয়েই বেরিয়েছি। আমার জন্য আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। আমি সি-আই-ডি ইনেসপেক্টার, আপনার কাছে একটা কথা জানতে এসেছি। বলুন তো, আপনি কোথায় জন্মেছেন? কলিকাতায় না কলিকাতার বাইরে?

—আমার জন্ম কাশীতে।

—আপনার মাকে আপনার মনে আছে?

—না, আমার এক বছর বয়সে আমার মা মারা যান। সৎ-মাকেই আমি মা বলে জানি।

—আপনার মায়ের নামটা আপনি জানেন?

—সুষমা রায়।

—আপনি কখনো মামার বাড়ী গেছেন?

—না। আমার মামা কেউ নেই। মা ছিলেন দাদুর একমাত্র মেয়ে। দাদু কাশীতেই থাকতেন। মা মারা যাবার পর দাদুর শরীর ভেঙে পড়ে, বছর কয়েক পরে দাদু মারা যান। দাদুকে আমি দেখেছি, কিন্তু এখন ভাল মনে পড়ে না।

—দাদুর নামটা কি জানেন ?

—না, সেটা আপনি আমার বাবার কাছে গেলে সব জানতে পারবেন।

—বেশ, আপনার বাবার ঠিকানাটা বলুন ?

অনিলবাবু শিবানীর বাবার ঠিকানাটা ডায়েরিতে লিখে নিয়ে উঠে পড়লো।

শিবানী বললো—ব্যাপারটা কি কিছু তো বললেন না ?

—পরে শুনবেন, আরো হয়তো দু-একবার আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য আসতে হবে—বলে সংক্ষেপে নমস্কার করে অনিল দত্ত বিদায় নিল। পিছনে রেখে গেল একটা রহস্যের ইঙ্গিত।

করোনারের আদালতে ময়না তদন্ত শেষ হলো।

করোনার রায় দিলেন,—সুষমা সেনের মৃত্যু ঘটেছে আকস্মিক ভাবে। রাত্রে কোন ঔষধ খেতে গিয়ে তিনি ভুল করে বিষ খেয়ে ফেলেছেন, সেই বিষের প্রতিক্রিয়ায় তাঁর মৃত্যু ঘটেছে।

করোনারের এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি ছিল কয়েকজনের সাক্ষ্য ও যুক্তি।

শিবানী রায় সাক্ষ্যে বললো যে পূর্বদিন রাত ন'টা পর্যন্ত আশ্রমকে কিভাবে বড় করা যায় সেই পরিকল্পনা নিয়ে সুষমাদি তার সঙ্গে আলোচনা করেন। পঞ্চাশজন মেয়ের স্থলে একশত মেয়ের সঙ্কুলান করার দিকেই তাঁর যে আগ্রহ প্রকাশ পায়, তাতে সেই রাত্রেই তিনি যে আত্মহত্যা করতে পারেন এ ভাবতেও পারা যায় না।

পরিচারিকা বললো—রাত দশটায় যথারীতি ঘণ্টা বাজার পর তিনি প্রত্যেকটি মেয়ের খবর নিয়ে যথারীতি শুতে যান। তখন তাঁর ব্যবহারে কোন রকম চাঞ্চল্য প্রকাশ পায় নি।

পুলিশ ইনেসপেকটার বললেন—টেলিফোন পেয়েই তাঁরা আশ্রমে

স্থান এবং সুপারিনটেনডেণ্টের শয়নকক্ষ যথারীতি ভিতর থেকে বন্ধ দেখতে পান। তাঁরা দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকেন। দেখা যায় খাটের উপর মিসেস সেন স্বাভাবিকভাবে শুয়ে আছে, পাশের টেবিলের উপর কাচের গ্লাস। টেবিলের নীচে কাগজের ঝুড়িতে ঔষধের পুরিয়ার একটি ছোট খাম তাঁরা দেখতে পান, কিন্তু সেই খামের গায়ে কিছুই লেখা ছিল না। সেইজন্য কি ওষুধ কোথা থেকে কেনা কিছুই তাঁরা সন্ধান করতে পারেন নি। আশ্রমের দারোয়ানও কিছু বলতে পারে নি।

ডাক্তার বললেন—মৃতদেহ পরীক্ষা করে দেখা গেছে, কোন ঘুমের ওষুধ অতিরিক্ত পরিমাণে সেবনের জন্য হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়েছে।

এই সব সাক্ষ্য আকস্মিক মৃত্যুরই ইঙ্গিত করে।

রায় শুনে অনিলবাবু বললেন—যাক্, অন্ততঃ একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

সুধীরবাবু ছিলেন পাশে, বললেন—কী?

—যদি কেউ মিসেস্ সেনকে হত্যা করে থাকে সে দুশ্চিন্তা থেকে পরিত্রাণ পেলে।

—যে ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ সে ঘরে অন্যলোক বিষ খাওয়াবে কেমন করে?

—বিষটা সব সময় কাছে বসে খাওয়াতে হবে এমন কোন কথা নেই, হাতের কাছে বিষটা জুগিয়ে দিলেই তো খাওয়ানোর কাজ হলো। ওষুধের বদলে বিষ রেখে দিলাম, যখন খুশি খাক্, নিজের হাতেই খাবে এবং মরবে।

—তোমার কি সত্যি সন্দেহ হয় মিসেস্ সেনকে কেউ বিষ জুগিয়ে দিয়েছে?

—সন্দেহ নয়, সে সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ, এবং তাই আমি একদিন আদালতে প্রমাণ করবো।

—ব্যাপারটা কি বলত?

—এখন নয়, খুন-খারাপির ব্যাপার, মন্ত্রগুপ্তির প্রয়োজন আছে। আগে আসামীকে ধরি, পরে আদালতে বসেই সব কথা শুনো।

কথায় কথায় চারজনে বড় রাস্তায় বাস-স্ট্যাণ্ডের সামনে এসে দাঁড়ালো।

এক মহিলা সেখানে দাঁড়িয়েছিল, শিবানী তাকে দেখেই চমকে উঠলো। বললো—আপনি এখানে ?

মহিলা শিবানীর মুখের পানে তাকালো, তারপর বললো—মুঝে কুছ্ বোল্না চাহতী ?

শিবানী থতিয়ে গেল। বললো—আপনি বাঙালী নন ?

মহিলা হাসলো, বললো—হামি বাংলা বুঝতে পারি, লেকেন বোলতে পারি না।

ইতিমধ্যে একখানি বাস এসে পড়লো, মহিলা বাসে উঠলো।

কমল জিজ্ঞাসা করলো—উনি কে ?

শিবানী বললো—এ-ই কিন্তু সকালে আমার সঙ্গে দেখা করেছিল, আশ্রমে গিয়ে বললো, 'আমি তোমার শাশুড়ী, আমার ছেলের খবর নিতে এসেছি।' আর এখন বলছে, 'আমি বাংলা জানি না।' দু'জন লোকের কি এমন অবিকল এক রকম চেহারা হয় ?

—এই মহিলা তোমার কাছে আমার মা বলে পরিচয় দিয়েছিল ?

—এই মহিলা আর কি করে বলি, তবে তাঁকেও দেখতে ঠিক এঁরই মত।

সুধীরবাবু বললো,—এই মহিলার মুখখানা আমার চেনা-চেনা মনে হলো, কোথায় যেন দেখেছি।

অনিল পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সুধীরের কথা শুনে হাসলো, বললো—তুমি আবার মাঝে মাঝে গোয়েন্দাগিরি কর, অথচ তোমার স্মৃতিশক্তি তো বড় দুর্বল। যারা কলকাতার গুণ্ডা-বদমায়েশের আড্ডায় দু'চার বার যাওয়া আসা করেছে, তারাই এই রমণীরত্নটিকে চেনে। ইনি চোরাকারবারীদের রাণী—কুইন অফ্ স্মাগলার্স। রূপসী বিবি।

—রূপসী বিবির তো অনেক পয়সা, সে এইভাবে ট্রামে-বাসে ঘুরছে ?

—করোনারের আদালতে রায় শুনতে এসেছিল, এখানে মোটর নিয়ে এলে সকলের নজরে পড়ে যাবে, তাই সাধারণভাবে এসেছে।

—করোনারের আদালতের রায় শুনে তার লাভ ? সে তো স্মাগ্‌লার, খুনখারাপি তো করে না। তাছাড়া আজ সুষমার কেস ছাড়া আর তো কিছু ছিল না।

—সুষমা সেনের ব্যাপারেই হয়তো ওর স্বার্থ জড়িয়ে আছে।

—তবে কি তুমি সন্দেহ করছ সুষমা খুন হয়েছে।

—প্রমাণ ছাড়া কোন কথা বলা চলে না। আমি তাই প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করছি। ইতিমধ্যে তুমি শিবানী রায়ের দিকে একটু সতর্ক দৃষ্টি রেখো। দু-একদিনের মধ্যে ওকেও খুন করার একটা চেষ্টা হবে।

সুধীর অবাক হয়ে তাকালো অনিলের পানে। কিন্তু অনিল আর কিছুই বললো না, একখানি ট্যাক্‌সি এসে পড়েছিল তাতে উঠে পড়লো, বললো—আমি এখন যাচ্ছি পার্ক সার্কাসে, রূপসী বিবির আড্ডায়। কাল সন্ধ্যাবেলা তোমার সঙ্গে দেখা করবো'খন।

অনিল চলে গেল, সুধীর কয়েক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। চমক ভাঙলো কমলের কথায়—লোকজনের ব্যবস্থা করি, শ্মশানে যেতে হবে তো ?

সুধীরবাবু দু'দিন বড় ব্যস্ত ছিলেন। আশ্রমের নতুন ভাবে সব ব্যবস্থা করতে তিনি বিব্রত হয়ে উঠলেন। সুষমা নিজ হাতে সব গড়েছিলেন। প্রতি পদে তাঁর অভাব অনুভূত হতে লাগলো।

তৃতীয় দিনে সুধীরবাবু একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। শিবানী নতুন সুপারিনটেণ্ডেণ্ট হলো, কমল তাকে সাহায্য করবে, আর সন্ধ্যার পর সুধীরবাবু নিজে এসে দু'ঘণ্টা বসবেন। তবে

আশ্রমটা বড় করার যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, কিছুদিনের মত তা চাপা রইল।

ঘরে বসে আরাম করে সুধীরবাবু চুরুট ফুঁকছেন, এমন সময় থানা থেকে এক দারোগা এসে হাজির হলো, বললো—আপনার কাছ থেকে একটা খবর জানতে এলাম। অনিলবাবুর কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না, আপনাদের সঙ্গে তাকে করোনারের কোর্টে দেখা গিয়েছিল, সেই থেকে তিনি নিরুদ্দেশ। আপনি কোন হদিশ বলতে পারেন?

—তিনদিন কোন খবর নেই?—সুধীরবাবু মুখ থেকে চুরুট নামালেন।

—না, তিনি কোথায় গেছেন, কেউ কিছু জানে না।

সুধীরবাবু কয়েক মুহূর্ত দারোগার মুখের পানে তাকিয়ে রইল, তারপর বললো—তিনদিন মানুষটার কোন খবর আপনারা নেননি?

—আজও খবর নেওয়া হতো না। তিনি ছুটিতে আছেন। তাঁর ছেলে থানায় ফোন করেছিল, তাইতেই তো আমরা জানতে পারলাম যে তিনি তিনদিন বাড়ী ফেরেননি।

—হুম্! কুইন অফ স্মাগ্‌লার্স রূপসী বিবির আস্তানা জানেন?

—পার্ক সার্কাসের ট্রামডিপোর কাছে।

—করোনারের কোর্ট থেকে বেরিয়ে সে 'সেইখানে যাচ্ছি' বলে ট্যাক্সিতে উঠেছিল, আপনারা সেইখানে একবার খোঁজ করুন দিকি।

—আপনারা বলছেন কাকে, গেলে আমাকে একাই যেতে হবে।

—আপনি কতদিন চাকরি করছেন?

—তিন বছর।

—এ লাইনে তাহলে তো আপনি নেহাৎ ছেলেমানুষ, সেই "স্মাগ্‌লার্স ডেনে' অনেক পুরানো ইনেস্‌পেক্টার ঘায়েল হয়ে গেছেন, সেখানে একা গিয়ে আপনি কি করবেন?

—কিন্তু আমার একার উপরেই হুকুম হয়েছে। চাকরি রাখতে হলে একাই যেতে হবে। সঙ্গে লোক চাইলেই উপরওলা কৈফিয়ৎ চাইবেন।

—উপরওলাদের এই এক মহা দোষ, গোড়ায় কোন কিছুই গ্রাহ্য করেন না, পরে হায় হায় করেন। এই জন্যেই তো চোর ডাকাত খুনে জুয়াড়ীদের এতো সুবিধা হয়েছে।

দারোগা বললো—তবে আমার কাছে রিভলভার আছে।

—আপনার কাছে আছে একটা, আর রূপসী বিবির আড্ডায় হয়তো আছে দশটা, আপনি একা তাদের কি করে সামলাবেন?

—আপনি যাবেন সঙ্গে? গাড়ী আছে।

যুবক দারোগার মুখের পানে তাকিয়ে সুধীরের করুণা হলো, বেচারা নেহাৎ ছেলেমানুষ, কুইন অফ স্মাগ্‌লার্স শুনে ভয় পেয়েছে। অবশ্য তাকে ভয় দেখানোর কোন ইচ্ছা সুধীরের ছিল না। সখের গোয়েন্দাগিরিতে সুধীরের আগ্রহ চিরদিনের, সাধারণ কয়েকটা খুনের ব্যাপারে সে আসামীদের ধরিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু 'স্মাগ্‌লার্স ডেন' দেখার সৌভাগ্য তার কোন দিনই হয়নি। কৌতূহল জাগলো, বললো—বেশ, তোমার সঙ্গেই যাওয়া যাবে, আগে এককাপ কফি খেয়ে মেজাজটা চাঙ্গা করে নিই, সারাদিন বড় খাটুনি গেছে।

হাতের কাছেই হিটার। প্লাগ্‌ লাগিয়ে দিয়ে সুধীরবাবু কেৎলিতে জল চাপিয়ে দিলেন।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই দু'জনে কফি খেয়ে বেরিয়ে পড়লো। ছোট একটা সাতঘড়া পিস্তল ছিল, ড্রয়ার থেকে সেটা বের করে কার্তুজ ভরে নিয়ে সুধীরবাবু পকেটে ফেললো। বললো—তোমার পিস্তল রেডি আছে তো?

দারোগা মাথা নাড়লো, দু'জনে এসে জিপে উঠলো।

বেহালা থেকে পার্ক সার্কাস পথ নেহাৎ কম নয়, তার উপর সুধীরবাবু পথে নেমে পার্ক স্ট্রীট থানায় একটা টেলিফোন করলেন, বললেন—সাবধানের বিনাশ নেই। গুণ্ডা জুয়াড়ীকে বিশ্বাস নেই। জানিয়ে যাওয়াই ভালো, বিপদে পড়লে সাহায্য পাবার আশা থাকবে।

গাড়ীখানি পথের মোড়ে রেখে দু'জনে পদব্রজে অগ্রসর হলো।

কিছুদূর গিয়েই তেমাথার মোড়ে একটি মোটর গ্যারেজ, পর পর কয়েকখানি পুরানো মোটর রয়েছে, জন কয়েক 'মেকানিক' কাজ করছে, সামনে মোটর মেরামতী কারখানার মস্ত সাইনবোর্ড।

দারোগা বললো—এইটাই তো রূপসী বিবির আড্ডা।

সুধীর বললো—পিছন দিক দিয়ে ঘুরে যেতে হবে।

দু'জনে কারখানার পিছনের পথ ধরলো।

চারিপাশে উঁচু পাঁচিল দেওয়া। উপরে টিনের সেড। ভিতরে নজর দেবার মত কোথাও কোন ফাঁক নেই। কারখানা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে পিছনের দিকে দেয়ালের সঙ্গে লাগাও দোতলা একটা মাঠকোঠা। মাঠকোঠার সামনে খাটিয়ার উপর দু'জন হিন্দুস্তানী বসে গল্প করছে। দোতলাটা অন্ধকার। সুধীর বললো—কে বলবে যে এই মাঠকোঠা থেকে লাখ লাখ টাকার স্মাগলিং চলে।

দারোগা বললো—দোতলা তো অন্ধকার।

—তাইতো সন্দেহ হচ্ছে, দোতলায় লোক আছে। কিন্তু দোতলায় উঠি কি করে, নিচে তো দু'জন পাহারা দিচ্ছে। আমাদের সময় ও সুযোগের প্রতীক্ষা করতে হবে।

ইতিমধ্যে খাটিয়ায় যে দু'জন বসেছিল, তারা এদের লক্ষ্য করেছে। একজন চীৎকার করে বললো—কি দেখতেছেন বাবু, কাকে খুঁজতেছেন ?

সুধীর ধীরে ধীরে তার কাছে এগিয়ে গেল, বললো—বিবি উপরে আছে ?

দ্বিতীয় লোকটি এবার পরিষ্কার বাংলায় বললো—আপনি কোথা থেকে আসছেন ?

—আসছি অনেক দূর থেকে, তোমরা আমাদের চিনবে না। বিবি সাহেবা আমাদের চেনেন, তিনিই বলে দিয়েছিলেন রাত আটটার পর আসতে।

—তিনি কি আপনাকে এখানে আসতে বলেছেন ?

—তখন তো বেশী কথা বলার সময় পায়নি, পিছনে টিকটিকি

লেগেছিল, তাড়াতাড়ি বাসে উঠে পড়লেন, শুধু বললেন—'আসবেন আটটার পর।' সেই দিনই আসতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু এক ব্যাটা ভিখিরী দু'দিন ধরে জোঁকের মত পিছনে লেগেছিল, কোন মতেই এড়াতে পারছিলাম না, আজ ব্যাটাকে বেলেঘাটার লেকের ধারে ধাক্কা মেরে এক খানায় ফেলে দিয়েছি। কেউ তুলে না দিলে আর উঠতে হবে না। সেই ফাঁকে চলে এলাম। আমাদের তো আর বসে থাকলে চলবে না। একদিন বসে থাকা মানে অনেকগুলো টাকা লোকসান। এখন বিবির সঙ্গে কথাটা শেষ করতে পারলেই হয়, শেষ ট্রেনে এখান থেকে চলে যাবো।

লোকটি সুধীর ও দারোগার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ চোখে এক বার দেখে নিল, তারপর বললো—বিবি এ বাড়ীতে নেই, আসুন!

কয়েক শ' গজ দূরে একখানি নতুন বাড়ীর দোতলায় নীল আলো জ্বলছিল, লোকটি সেই বাড়ীটি দেখিয়ে দিয়ে বললো—ঐখানে যান, দেখা হবে।

সুধীর ও দারোগা সেই বাড়ীর দিকে অগ্রসর হলো।

নীচের তলায় সদর দরজা খোলাই ছিল, সামনেই সিঁড়ি, দু'জনে সতর্ক ভাবে উপরে গিয়ে উঠলো, কোথাও কেউ কোন বাধা দিল না। দোতলায় সিঁড়ির মুখে গোল করে ঘুরানো বারান্দা, সেই বারান্দার উপর নিয়নের নীল আলো জ্বলছে। কোন লোক নেই। একপাশে দেয়ালের দিকে শুধু একখানি সোফা। সোফার উপর একটি লোক লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। লোকটির মুখের পানে নজর পড়তেই দু'জনে চমকে উঠলো।

সে মুখ অনিল দত্তের। নিয়নের আলোয় মুখখানি ছাইয়ের মত বিবর্ণ দেখাচ্ছে। জীবিত কি মৃত বোঝা যায় না।

শিল্পাশ্রমের কর্মসূচীতে লেখাপড়ার ব্যাপারটা রাত্রে। দিনের

আলোয় হাতের কাজ শেখার সুবিধা, তাই চামড়ার কাজ, পুতুল গড়া, সেলাইয়ের কাজ, ছাঁটকাট শেখা, এগুলো হয় সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি। সন্ধ্যার পর ক্লাস বসে, শেখানো হয় বাংলা, ইংরাজী ও অঙ্ক। বাংলা পড়ায় শিবানী, সুষমা ইংরাজী পড়াতেন, অঙ্ক সবদিন হতো না। সুষমার মৃত্যুতে কমল ইংরাজী পড়াবে ঠিক হয়েছে। আজ থেকে কমলের আসার কথা। শিবানী বাংলা পড়াচ্ছে, রাত আটটা বেজেছে কমল এলেই সে ছুটি পায়।

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে একটা ছেলে এসে পড়লো, হাঁপাতে হাঁপাতে বললো—শিবানীদি, আমাদের ডাক্তারখানায় এইমাত্র টেলিফোন এলো, বাস একসিডেণ্ট হয়ে কমলদা বাংগুর হাসপাতালে গেছেন, বাবা আপনাকে খবর দিতে বললেন।

শিবানী চমকে উঠলো, ছেলেটি কে, কোন্ ডাক্তারখানায় ফোন এসেছে, কিছুই আর জিজ্ঞাসা করা হলো না, বললো—বাংগুর হাসপাতালে? কি হয়েছে কিছু বললে?

—না, টেলিফোনে শুধু খবরটা দিয়েছে।

তখনই পড়ানো বন্ধ করে শিবানী উঠে পড়লো।

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করলো—তুমি কি এখনই যাবে, একখানা ট্যাক্সি ডেকে দোব?

—দাও না ভাই, তাহলে ভারী উপকার হয়। কিন্তু এখনই ট্যাক্সি পাওয়া যাবে কি, আমি বরং বাসে করেই চলে যাই।

—বাসে গেলে অনেক হাঁটতে হবে, বসার জায়গা পাবে না, আমি এখনি ট্যাক্সি ডেকে আনছি।

ছেলেটি এক দৌড়ে বেরিয়ে গেল। দু'মিনিটের মধ্যে ট্যাক্সি এনে হাজির করে দিল। বললো—শিবানীদি, গাড়ী এনেছি।

শিবানীর তখন দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান নেই, হুড়মুড় করে এসে গাড়ীতে উঠে বসলো। বললো—বাংগুর হাসপাতালে চলো!

ডায়মণ্ড হারবার রোডের উপর দিয়ে শাঁ শাঁ করে গাড়ী ছুটলো। মিনিটের কাছাকাছি এসে গাড়ী মোড় ফিরলো ডান

দিকে। পথটা বড় নির্জন, কয়েক গজ গিয়েই গাড়ী থামলো। শিবানী বললো—এখানে থামলে কেন ?

ড্রাইভার কি বললো ঠিক বোঝা গেল না, তার পাশে আর একজন বসেছিল, সে টুক করে গাড়ী থেকে নেমে পড়লো, তারপরেই পিছনের দরজা খুলে শিবানীর পাশে উঠে বসলো। এবার শিবানীর হুঁস হলো, বললো—এ কি ? আপনি ?

কথা আর শেষ করতে হলো না, একখানি চকচকে ধারালো ছোরা চোখের উপর চিক্‌চিক্‌ করে উঠলো। শিবানী ভয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।

কয়েক মুহূর্তেই সুধীরবাবু আত্মস্থ হলেন। এগিয়ে গিয়ে অনিল দত্তের কপালে হাত দিলেন,—না, মানুষটা মরেনি, দেহে উত্তাপ আছে, শ্বাসপ্রশ্বাস বইছে। ধমনীর গতি পরীক্ষা করলেন—স্বাভাবিক, তবে মৃদু। ডাকলেন—অনিল! অনিল!

কোন সাড়া পাওয়া গেল না। অনিল সংজ্ঞাহীন।

দারোগা পকেট থেকে পিস্তল বের করেছিল। সুধীরও পিস্তল হাতে নিল, বললো—কোন মানুষের তো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না, এসো তো একবার বাড়ীটা ঘুরে দেখি।

দু'জনে পিস্তল হাতে নিয়ে দোতলার বারান্দাটা ঘুরে এলো, চারখানি মাত্র ঘর, সব ঘরই বাইরে থেকে দরজায় শিকল দেওয়া, নীচের তলা সম্পূর্ণ অন্ধকার। সুধীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো—খালি বাড়ী পেয়ে ওরা এই কাণ্ড করেছে। দারোয়ান বেটা সব জানে বলেই আমাদের এই বাড়ীটা দেখিয়ে দিয়েছে। ওর সম্পর্কে যা করার পরে করা যাবে, এখন অনিলকে ধরাধরি করে নীচে নামিয়ে নিয়ে যাই, তারপর গাড়ী করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

দু'জনে ধরাধরি করে অচেতন অনিলকে নীচে নামালো। সুধীর বললো—আমি পাহারায় রইলাম, তুমি গাড়ী নিয়ে এসো।

দারোগা গাড়ী আনতে ছুটলো।

সুধীর অপেক্ষা করছে এমন সময় ওদিক থেকে একখানি মোটর এলো। ভাঙা মোটরখানি ঝিকঝিক ঝিকঝিক করতে করতে একটু গিয়ে থেমে গেল। তারপর আবার চলতে সুরু করলো। রোয়াকের অন্ধকারে সুধীর দাঁড়িয়েছিল, সহসা চোখে পড়ার কথা নয়, মোটরখানি ঝিকঝিক করতে করতে চলে গেল। মোটরের চালকেরা সুধীরের দিকে বিশেষ খেয়াল করলো না।

মোটরখানির পানেই সুধীরের লক্ষ্য ছিল। গাড়ীখানি পথের-মোড়ে অদৃশ্য হতেই সুধীর এদিকে দৃষ্টি ফেরালো। সহসা তার নজরে পড়লো, ওদিকে যেখানে মোটরখানি থেমে গিয়েছিল, সেই-খানে একজন মানুষ পড়ে আছে। সুধীর ভালোভাবে নজর করলো, একটা গাছের ছায়ায় জায়গাটা অন্ধকার। তবু মানুষ যে পড়ে আছে তাতে কোন ভুল নেই। ওই মোটরওয়ালারাই ফেলে দিয়ে গেল নাকি?

সুধীর পিস্তল বাগিয়ে নিয়ে সেইদিকে এগিয়ে গেল।

পরনে শাড়ী, স্ত্রীলোক। চুলে মুখ ঢাকা। সুধীর মুখের উপর থেকে চুল সরালো। একি! এ যে শিবানী! সুধীর তখনই শিবানীর ধমনীর গতি পরীক্ষা করলো, না মরেনি। অচেতন।

সুধীর কোন দ্বিধা না করে শিবানীকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। ধীরে ধীরে নিয়ে অনিলবাবুর পাশে রোয়াকের উপর শুইয়ে দিল। চোখে পড়লো শিবানীর গলার হার ও হাতের চুড়ি ঠিকই আছে। যারা তার এই অবস্থা করেছে তারা সাধারণ চুরি-ডাকাতির জন্য কিছু করেনি তা বোঝা গেল। অনিল ও শিবানী একই দলের দ্বারা নিগৃহীত হয়েছে, দু'জনের অবস্থা একই রকম, এবং একই সময়। এখানে শিবানীকে এনে ফেলে দেওয়ার উদ্দেশ্যই হলো তাদের নজরে ফেলা, যেন দু'জনকে একই সঙ্গে তারা নিয়ে যায়। তারা যে এখানে এসেছে, তা রূপসীবিবির আড্ডার

লোকেরা জানে। এবং অলক্ষ্যে তাদের উপর নজর আছে। সুধীরবাবু দেওয়ালে পিঠ রেখে পিস্তল হাতে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

একটু পরেই জিপ এসে পড়লো। দুটি মানুষ দেখে দারোগা বললো—এ আবার কোথা থেকে এলো?

সুধীর বললো—এসে পড়েছে, পরে সব শুনো, এখন তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরে পড়ার চেষ্টা কর।

তাড়াতাড়ি দু'জনকে জিপে তুলে নিয়ে তারা সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লো। সুধীর বললো—আগে চল নীলরতন হাসপাতালে।

অনিল ও শিবানীর জ্ঞান হলো পরদিন সন্ধ্যায়। তাদের বেশীক্ষণ আচ্ছন্ন রাখার জন্য মর্ফিয়া ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছিল। ডাক্তার বললেন—আরেকটু বেশি মাত্রায় হলে, এ ঘুম আর ভাঙতো না।

এক কাপ গরম কফি খেয়ে অনিল চনমনে হয়ে উঠলো, বললো—ক'দিন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম? আজ কি বার?

—বেস্পতিবার—সুধীর জবাব দিল।

—সোমবার ওরা আমায় ধরেছিল, মঙ্গল, বুধ, বেস্পতি—তিনদিন হয়ে গেল, ঠিক আছে, একখানা গাড়ী ডাকো, এখনি আমায় বেরুতে হবে।

—খুব জরুরী কি? নাহলে একটু বিশ্রাম করে···

—না না, তিনদিন ঘুমিয়েছি আর বিশ্রাম নয়, দু'লাখ টাকার ব্যাপার, এখনও হাতে আছে কি না কে জানে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই অনিল হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে পড়লো। দারোগা কাছেই ছিল, বললো—বাড়ীতে খবর দিও, আমি আসছি।

ট্যাক্সিতে উঠে সুধীর জিজ্ঞাসা করলো—ব্যাপারটা কি বলত? এখন যাচ্ছ কোথায়?

—এটর্নির কাছে। চেকখানা ওরা বের করে নিয়ে গেছে কিনা জানতে হবে। দু'লাখ টাকা বড় কম কথা নয়।

সুধীরবাবু ধাঁধায় পড়লেন, বললেন—খুলে বল না, ব্যাপারটা বুঝি।

অনিল বললো—ব্যাপার জটিল। বিশ বছর আগে বেনারসে এক বাঙালী ডাক্তার ছিলেন, বিশ্বম্ভর রায়। তাঁর একমাত্র মেয়ে সুষমা, সে এক অবাঙালী যুবককে বিয়ে করতে চায়। পিতা বিবাহে অসম্মত হন। তবু যুবক সুষমাকে বিয়ে করে বোম্বাই চলে যায়। ইতিমধ্যে সুষমার একটি কন্যা জন্মায়। বিশ্বম্ভর বাবু তখন বেনারসের এক রেল-অফিসারের পত্নীর চিকিৎসা করছিলেন, সামাজিক কলঙ্কের জন্য ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি সেই অফিসারের স্ত্রীর হাতে সদ্যজাত কন্যাটিকে সঁপে দেন। অফিসার তাকেই নিজের কন্যা বলে মানুষ করতে থাকেন।

ইতিমধ্যে বিশ বছর কেটে যায়। সেই অবাঙালী-যুবক ইতিমধ্যে ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থোপার্জন করেন। সহসা তাঁর গলায় ক্যান্সার হয়, চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসেন। দুরারোগ্য রোগ, নিরাময়ের কোন সম্ভাবনা নেই দেখে, তিনি ধর্মচিন্তায় মন দেন। প্রথম জীবনের সুষমার কথা তখন তাঁর মনে হয়। তিনি সুষমার সন্ধান করেন। কিন্তু তখন সুষমার খোঁজ পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। ডাক্তার বিশ্বম্ভর রায় দশ বছর আগে মারা গেছেন, সুষমা কাশীর বাড়ীঘর বেচে কলিকাতায় বাস করে। আর সেই রেলওয়ে অফিসারও রিটায়ার করে কলিকাতায় চলে এসেছেন। আশী লাখ অধিবাসীর জনারণ্যে বিশ বছর আগেকার মানুষ হারিয়ে গেছে।

মোহনলাল হাসপাতালে অনিলের হাতখানি চেপে ধরে বললো—আমি আর বেশীদিন বাঁচবো না, গলায় বড্ড যাতনা, কথা বলতে কষ্ট হয়। আমি চার লাখ টাকা উইল করে গেলাম। দু'লাখ

সুষমার, আর দু'লাখ আমার সেই মেয়ের, তারা যেখানেই থাক্ আপনি তাদের খুঁজে বের করে টাকাটা তাদের হাতে পৌঁছে দেবেন। এর জন্য আপনার পারিশ্রমিক বাবদ দশ হাজার টাকা রেখে গেলাম। যদি এক বছরের মধ্যে কোন সন্ধান না হয় তো টাকাটা রামকৃষ্ণ মিশনে চলে যাবে।

দিন পনেরো পরে মোহনলাল মারা গেলেন।

অনিল অবসর মত খোঁজ খবর করতে লাগলো। শেষে অনিল সুষমা সেনকে আবিষ্কার করলো, আর আবিষ্কার করলো শিবানীকে। সুষমা প্রথমে অনিলের কাছে কোন কথাই মানতে চায়নি, পরে যখন দেখলো অনিল সবই জানে, তখন সে স্বীকার পেল, শিবানী যে তার মেয়ে একথা সুষমা জানতে পারে, জানে বলেই কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে সে শিবানীদের শিল্পাশ্রমের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল, এবং আশ্রমটি বৃহত্তর করার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু বেচারা জানতো না যে রূপসীবিবি ওই টাকাটার উপর নজর দিয়েছে। রূপসী বিবির চক্রান্তেই সে প্রাণ হারিয়েছে। শিবানীকে ও আমাকে সরাতে পারলে রূপসীর পক্ষে টাকাটা বের করে নেওয়া আরো সহজ হয়। কিন্তু দুটো খুনের দায়িত্ব সে নিতে চায় না। সেইজন্যেই আমরা রক্ষা পেয়ে গেছি। আমাকে তিনদিন আটকে রেখে খুব সম্ভব সে টাকাটা বের করে নিয়ে গেছে।

হেস্টিংস. স্ট্রীটের এটর্নি আপিসে তারা এসে পড়লো। কর্মচারীদের ছুটি হয়ে গেছে, এটর্নি বাবু একাই বসে ছিলেন। অনিলকে দেখেই বললেন—আপনি এতো ঘোরাঘুরি করে সংবাদ আনতে পারলেন না, এদিকে সুষমা সেন নিজে এসেছিল সোমবারে। ভাবলাম আপনাকে জানাবো কিন্তু দু'দিন টেলিফোন করেও আপনাকে পেলাম না।

—চেক নিয়ে গেছে ?

—কোর্ট থেকে এফিডেভিট করিয়ে এনেছে, আমাকে বাধ্য হয়ে দু'লাখ টাকার চেক দিয়ে দিতে হলো।

—যে চেক্ নিয়ে গেছে সে জালিয়াৎ, আসল সুষমা সেন খুন হয়েছেন, সোমবার করোনারের আদালতে তাঁর ময়না তদন্ত হয়ে গেছে।

এটর্নি হাঁ হয়ে গেলেন।

কয়েক মিনিট দম নিয়ে বললেন—চেকখানা ক্রস করা আছে, ভাঙাতে হবে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে। সেই সূত্র থেকে হয়তো কোন কিনারা হতে পারে।

পরদিন সকাল দশটার আগেই অনিল ব্যাঙ্কে ছুটলো। ব্যাঙ্ক জানালো মঙ্গলবারেই চেক জমা হয়ে গেছে। যে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে জমা হয়েছে অনিল ছুটলো সেই ব্যাঙ্কে। সেখানে শুনলো বৃহস্পতিবার আমানতকারী পঞ্চাশ হাজার টাকা তুলে নিয়ে গেছে। দেড় লাখ টাকা এখনও আছে।

অনিল বললো—যাক্, তবু দেড় লাখ বাঁচাতে পারলাম, এইটাই যথেষ্ট।

সুধীর সঙ্গে ছিল, বললো—ব্যাঙ্কের খাতায় তো ঠিকানা আছে, সেখানে একবার খোঁজ করবে?

অনিল বললো—যেখানে সুষমা সেন মানুষটাই জাল, সেখানে তার ঠিকানা কখনও আসল হতে পারে? মিছে পরিশ্রম করে কোন লাভ নেই।

যাক, বাকি টাকাটা কেউ তুলতে এলে যেন তৎক্ষণাৎ পুলিশে জানানো হয়—এই ব্যবস্থা করে অনিল বাড়ী ফিরলো।

বাড়ী এসেই অনিলবাবু একখানি চিঠি পেল, টাইপ করা ইংরাজি চিঠি:

প্রিয় মহাশয়, আপনার জন্য আমাদের কারবারে এবার দেড়লাখ টাকা লোকসান দিতে হলো। কোম্পানি আপনার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখতে চায় না। ভবিষ্যতে আপনি সতর্ক হবেন।

বার বার এই ধরনের লোকসান সহ্য করা কোম্পানির পক্ষে সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে যদি আপনার জন্য কোম্পানিকে কোন লোকসান দিতে হয় তাহলে আপনার বিরুদ্ধে বিধিমত ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে আমরা বাধ্য হবো। পূর্বাহ্নেই আপনাকে সবিশেষ অবগত করালাম, ইতি—

পরিচালক : আর. বি. এণ্ড কোম্পানি।

একেবারে ব্যবসাদারি চিঠি। কিন্তু কোন ঠিকানা নেই। না থাক্, আর. বি. এণ্ড কোম্পানি, অনিল একবার দেখেই বলে উঠলো রূপসী বিবি এণ্ড কোম্পানি। স্মাগলিংও তাহলে এতদিনে ব্যবসার পর্যায়ে উঠলো! দেখা যাক্!

কিন্তু বেশি দিন দেখতে হলো না, আর. বি. কোম্পানির সঙ্গে অনিলের সংঘাত বেধে গেল কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই। তবে সে আর-এক কাহিনী।

জটাধারী

আমাদের জীবনে অনেক সময় এমন অনেক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে, সত্যই যার কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। বিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরা চুপ করে থাকেন, মনস্তাত্ত্বিকেরা অবচেতন মনের ব্যাখ্যা করে যুক্তি দেখাবার চেষ্টা করেন। রহস্য কিন্তু রহস্যই থাকে। এমনি এক বিস্ময়কর রহস্য ঘটেছিল আমার এক আত্মীয়ের জীবনে, সেই কথাই বলি।

দিলীপ আমার সহপাঠী। তাছাড়া দূর সম্পর্কে একটা আত্মীয়-তাও ছিল। এক সঙ্গে ইস্কুল ও কলেজে পড়ার ফলে আত্মীয়তার চেয়ে বন্ধুত্বের অন্তরঙ্গতা হয়েছিল বেশী। দু'জনে আলোচনা না করে আমরা কোন কিছু করতাম না। কলেজের ক্লাসে, বায়োস্কোপে, খেলার মাঠে আমরা সব সময়েই পাশাপাশি থাকতাম। এই ঘনিষ্ঠ-তার মাঝে ছেদ পড়লো ছাত্রজীবনের শেষে। ওকালতি পাস করে আমি ওকালতি সুরু করলাম আর দিলীপ বনবিভাগে চাকরী নিয়ে চলে গেল ছোট নাগপুরে।

বছর পাঁচেক সে আর কলিকাতায় আসেনি। অনেকদিন কোন খোঁজ-খবরও পাইনি, কাজের চাপে আমিও তার কোন খবর রাখিনি। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা ঘরে বসে আছি এমন সময় সে এসে ঢুকলো। অশৌচের বেশ। প্রথমটায় চমকে উঠেছিলাম, তার-পর বললাম—কি হোল ?

— বাবা মারা গেছেন—বলে একখানি চেয়ারের উপর একটি কম্বলের আসন পেতে সে বসে পড়লো। একান্ত ক্লান্ত ও অবসন্নের মত সে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল।

সান্ত্বনা দেবার ইচ্ছায় বললাম—বাবার বয়স তো খুব বেশী হয়নি, হঠাৎ মারা গেলেন, কি হয়েছিল ?

—বয়স হয়েছিল বাষট্টি। শরীরে শক্তি ছিল। হঠাৎ পনেরো মিনিটের মধ্যে হার্টফেল করেছে—করোনারী থ্রম্বসিস্।

—তাহলে শেষকালে তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি ?

—না। তবে সেটা আমারই দোষ। ব্যাপারটা আমি তেমন-ভাবে ভাবিনি, নাহলে বাবা মারা যাবেন আমি আগেই জানতে পেরেছিলাম, অন্তত আমার বুঝতে পারা উচিত ছিল।

—ব্যাপারটা কি ?

—ব্যাপারটা খুলে বললেই সব বুঝতে পারবে।

দিলীপ সুরু করলো তার কাহিনী :

আমার কথা শুনলে তুমি হয়তো ভাববে যে আমার মাথার ঠিক নেই। কিন্তু ব্যাপারটা এমনই যে গভীর ভাবে চিন্তা করলে তুমিও বিহ্বল হয়ে পড়বে। তখন যারা তোমার কথা শুনবে তারাই ভাববে তোমারও মাথার ঠিক নেই। ব্যাপারটা আমাকে শুধু বিভ্রান্তই করেনি, এর কোন সমাধান আমি খুঁজে পাইনি। আর কারও কাছে আলোচনা করে এসম্পর্কে একটা সদুপদেশ যে নেবো তা তুমি ছাড়া আমার তেমন বন্ধুও কেউ নেই। তাই তোমার কাছেই ব্যাপারটা বলতে এলাম।

তুমি তো জানো আমি প্রথমে যাই শালবনী। বছর খানেক সেখানে থাকার পর আমাকে বদলী করে দেয় রাঁচীতে। রাঁচী বলতে রাঁচী সহর নয়। রাঁচীর উপকণ্ঠে যে বিরাট পার্বত্য বনভূমি আছে সেই অঞ্চলে। আমার থাকবার জায়গা হলো বাদাম পাহাড়ের কাছে এক গাঁয়ে। বাদাম পাহাড় ওই অঞ্চলে বনভূমির সৌন্দর্যে সর্ব-শ্রেষ্ঠ। সারি সারি বড় বড় শাল গাছ, কে যেন সারি দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে। মাঝে মাঝে খানিকটা জায়গা জুড়ে হলুদ ফুলের বন। বড় বড় গাছ, এক গাছ সূর্যমুখীর মত ফুল ফুটে আছে, প্রজাপতির ঝাঁক সূর্যের আলোয় রঙীন পাখা ঝলমলিয়ে সেই গাছগুলির চারিপাশে ঘুরছে। হরিণের ছোট ছোট দল মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। রাত্রে অনেক সময় জানালার পাশ দিয়ে থুপ থুপ করে ভালুক চলে যেতেও

দেখি। মনে হতো যেন আদিমকালে ফিরে গেছি। বনভূমিতে মানুষ আর জানোয়ার পাশাপাশি বাস করছি। জায়গাটি আমার ভালো লেগেছিল।

ওঁরাওদের নগণ্য একখানি গ্রাম। দশ-পনেরো ঘর লোকের বাস। গ্রাম সংলগ্ন খানিকটা ধানজমি। সেই গাঁয়েরই উপকণ্ঠে একখানি কাঠের বাড়ীতে আমার বাস। আমি আর আমার সঙ্গী বিশ্বস্ত এক নেপালী দরোয়ান, আর একটি বন্দুক। কাজ কিছুই নেই। মাসে শুধু একটি করে রিপোর্ট পাঠানো, আর চুপ করে বসে থাকা। আর কোন কাজ নেই। কলিকাতা থেকে বই আনাই আর বসে বসে পড়ি। কোন কোন দিন খেয়াল হলে বন্দুকটা কাঁধে ঝুলিয়ে খানিকটা ঘুরে আসি।

দিন কাটছিল নিশ্চিন্তে। হঠাৎ একদিন রাঁচী থেকে আদেশ এলো, মাইল তিনেক দূরে কালগাঁ নামে আরেকখানি গ্রাম আছে, তারই কাছে একটি পুরানো কালী মন্দির আছে সেখানে নাকি নরবলি দেওয়া হয়, গত বছর এই সময় সেখানে নরবলি হয়েছিল, আমি যেন সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখি। প্রয়োজন হলে পুলিশ আমাকে সাহায্য করবে।

তবু একটা কাজ পাওয়া গেল। একদিন দুপুরে বেরিয়ে পড়লাম কালী মন্দির দেখবার জন্য।

চওড়া পথ। শাল কাঠ কেটে এই পথে গাড়ী করে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সেই পথে আমি কালগাঁয়ে গিয়ে পৌঁছালাম। শীতের দিনে রোদে-রোদে পথ চলতে মোটেই কষ্ট হলো না। গাঁয়ের লোককে জিজ্ঞাসা করে শুনলাম, মন্দির ছাড়িয়ে আমি চলে এসেছি, মন্দিরটা আসার পথেই পড়েছে, সঙ্কীর্ণ একটা শাখা পথ দিয়ে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে একটু নজর রাখলেই চোখে পড়তো শালবনের মাঝে মন্দিরের মাথার ত্রিশূলটা।

ফিরলাম। পোয়াটাক পথ এসে জঙ্গলের মধ্যে সত্যই ত্রিশূল চোখে পড়লো। সরু একটা শাখা পথ চলে গেছে জঙ্গলের ভিতর।

সেই পথ দিয়ে একটু গিয়েই মন্দির। মন্দিরের কাছে গিয়ে সত্যই অবাক হয়ে গেলাম। এখন জীর্ণ ভগ্নশেষ হলেও মন্দিরটি যে গঠন-নৈপুণ্যে এক সময় ভালো ছিল তা বোঝা যায়। এই জঙ্গলের মধ্যে কে যে কেন এমন মন্দির তৈরী করেছিল তা ভাবলে বিস্ময় লাগে। কয়েক মাইলের মধ্যে তো মাত্র কয়েক ঘর লোকের বাস, তাদের জন্য এমন মন্দির কে এখানে করলো?

মন্দিরের কোন দরজা ছিল না। বরাবর গিয়ে উঠলাম মন্দিরে। পায়ে জুতো ছিল, ভিতরে আর ঢুকলাম না। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভিতরের মূর্তিটির পানে তাকালাম। এক কালীমূর্তি। হাত দুইয়ের বেশী উঁচু হবে না। অনেকটা কালীঘাটের কালীর মত। কিন্তু অমন ঘন কৃষ্ণ বর্ণের কালীমূর্তি আমি কখনও দেখি নি। কালো প্রতিমার লাল টক্‌টকে জিভটা ও সাদা চোখ দুটি যেন বড় বেশী স্পষ্ট হয়ে চোখে লাগে।

মন্দিরের ভিতরটা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। জঙ্গলের মধ্যে ভাঙামন্দিরে যেমন মাকড়সার জাল ও অপরিচ্ছন্নতা দেখার আশা করেছিলাম, তেমন কোথাও নেই। এ মন্দিরে মানুষের যাতায়াত আছে তা বোঝা যায়।

মন্দিরের সামনে আন্‌মনে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ কাঁধে কে হাত রাখলো, চমকে উঠলাম। পিছন পানে তাকিয়েই দেখি এক জটাধারী। পরক্ষণেই চিনলাম, কলিকাতায় তিনি মাঝে মাঝে বাবার কাছে আসতেন। কি একটা গাছের শিকড় ধারণ করিয়ে ইনি বাবার অর্শ নিরাময় করেন, সেই থেকেই বাবার সঙ্গে এঁর অন্তরঙ্গতা হয়। নত হয়ে জটাধারীর পায়ের ধূলা নিলাম। যত বার এঁকে বাড়ীতে দেখেছি তত বারই এঁর পায়ের ধূলা নিয়েছি, সেই অভ্যাসে আজও পায়ের ধূলা নিলাম।

জটাধারীর দৃষ্টি কোমল হলো। বললেন—তুই! তুই এখানে এসেছিস্ কেন?

—আমি যে এখানে চাকরী করি।

কি চাকরী করিস্ ?

—ফরেস্টারের চাকরী।

—তা তুই যখন এসে পড়েছিস, ভালই হয়েছে। মা তোকে পাঠিয়েছেন আমার শিষ্য হবার জন্য। ওই গাছ থেকে একটা ফুল তুলে আন, আমি তোকে মন্ত্র দিয়ে দিই। রোজ জপ করবি।

হঠাৎ একেবারে গুরু হয়ে বসার আগ্রহ আমার কাছে ভালো লাগলো না। বললাম—আজ থাক্, আর একদিন এসে মন্ত্র নিলেই হবে, এখন তাড়াতাড়ি কিসের ?

জটাধারীর ভ্রূদুটি কুঁচকে উঠলো, বললো—আমি যা বলি শোন্ তোর মঙ্গল হবে। ফুল আন্ !

এমন ভাবে ধমক দেওয়াটা বরদাস্ত করতে পারলাম না, জোর দিয়েই বললাম—না, আজ থাক, মন্ত্র নিতে হয় আরেক দিন নোব।

জটাধারীর ভ্রূদুটি আবার কুঁচ্‌কে উঠলো, বললো—তাহলে এখানে এসেছিস্ কেন ?

—উপর থেকে হুকুম এসেছে। কে এই মন্দিরে থাকে, রিপোর্ট দিতে হবে।

জটাধারীর চোখ দুটি ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলে উঠলো, বললো—আমি থাকি এখানে, রিপোর্ট দিস্ !

—কত দিন আপনি এখানে আছেন ?

—যতদিন আমার ইচ্ছে !

—বেশ, সেই রিপোর্টই আমি দোব !

—রিপোর্ট পরে দিবি, আগে নিজের ঘর সামলাগে যা ! —হাহা করে জটাধারী হেসে উঠলো।

হাসি সাধারণ হাসি নয়। সাধারণ লোকের মুখে তেমন হাসি আর কখনও শুনি নি। সে হাসি বুকে এসে ধাক্কা মারলে যেন। কেমন যেন ভয় হলো। আর কোন কথা না বলে পথে নামলাম। পিছনে জটাধারী আরেকবার অট্টহাসি হেসে উঠলো।

ভালো করে সাজিয়ে গুছিয়ে সারারাত বসে রিপোর্ট লিখলাম।

দুপুরে নেপালীকে পোস্টাপিসে পাঠালাম, রিপোর্টটা ডাকে দেবার জন্য। সন্ধ্যাবেলা নেপালী ফিরলো পোস্টাপিস থেকে। নিয়ে এলো একখানি টেলিগ্রাম। বাড়ী থেকে বাবা টেলিগ্রাম করেছেন : মা আগের দিন সন্ধ্যায় হার্টফেল করে মারা গেছেন।

মায়ের সঙ্গে আর দেখা হলো না।

কলিকাতায় এসে শ্রাদ্ধ-শান্তি শেষ করে মাসখানেক পরে আবার তো ফিরে গেলাম। গিয়ে শুনলাম আমার রিপোর্ট পেয়ে গোয়েন্দা পুলিশ ওই জটাধারীর উপর নজর রাখে। এবং ক'দিন পরে রাঁচীর কাছ থেকে একটি সাত বছরের ছেলেকে ভুলিয়ে নিয়ে যাবার সময় কালগাঁয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে। জটাধারী এখন জেলে আছে!

বাদাম পাহাড়ে দুটি বছর কেটে গেল। একান্ত নিরিবিলি দুটি বছর। জঙ্গল দেখা, রিপোর্ট লেখা, আর বই পড়া। মা মারা যাবার পর মনটা বড় উতলা হয়ে উঠেছিল। বই পড়তে সব সময় ভালো লাগতো না, বইয়ে মন বসতো না, প্রায়ই আহারাদির পর ঘুরতে বেরুতাম জঙ্গলে। ঘুরতে ঘুরতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়তাম, বসে থাকতাম শালবনের মাঝে কোন পাথরের ঢিবির উপর। বেশ খানিকটা সময় কেটে যেতো। জঙ্গলকে সবাই যেমন ভয় করে, আমার তেমন ভয় ছিল না। জঙ্গলে বাস করতে করতে জঙ্গলকে আমি ভালোবেসে ফেলেছিলাম। বনের মাঝে একা একা বসে থেকে বেশ শান্তি পেতাম।

একদিন বিকালে বন থেকে ঘুরতে ঘুরতে বাড়ী ফিরছি দেখি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে জটাধারী। মাথা থেকে পা পর্যন্ত জটা, গেরুয়া রঙের কাপড়। আমাকে দেখেই সে এগিয়ে এলো, চোখ দুটো ধ্বক ধ্বক করে জ্বলে উঠলো, বললো—তোর কাছেই এলাম!

তাকে দেখেই কেমন যেন ভয় হয়েছিল, তবু সাহস করে বললাম —কেন? আমার কাছে কি?

—তোর জন্যে দু'বছর জেলে খেটে এলাম, আর তোর সঙ্গে দেখা করবো না?

—আমার জন্যে জেল খাটো নি, অন্যায় করলে সবাইকে শাস্তি পেতে হয়।

—ন্যায় অন্যায়ের বিচার করার তুই কে?—জটাধারী আমাকে ধমক দিয়ে উঠলো।

কয়েক মুহূর্ত কোন উত্তর খুঁজে পেলাম না, কথা যেন হারিয়ে গেল, তারপর বললাম—ঠিক আছে, এখন পথ ছাড়ুন বাড়ী যাই!

—বাড়ী যাই! বাড়ীই তোকে যেতে হবে!

জটাধারী ফটক আটকে দাঁড়িয়ে ছিল, সরে গেল। তাকে পাশ কাটিয়ে আমি অগ্রসর হলাম। হঠাৎ সে আমার কাঁধের উপর এক খানি হাত রাখলো, আমার চোখের উপর আগুনের মত জ্বলজ্বলে দুটো চোখ রাখলো। আমি চমকে উঠেছিলাম, কিন্তু পরক্ষণেই এক ঝটকায় তার হাতখানি সরিয়ে দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলাম। আমার পিছনে হাহা করে জটাধারী হেসে উঠলো। সেই অট্টহাসি। সেই হাসি শুনে মাথার মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠলো। কাঁধ থেকে বন্দুকটা নামিয়ে নিলাম। বন্দুকটা তার পানে বাগিয়ে ধরে বললাম—এখানে আর এক মিনিট থাকলে, আমি তোমাকে গুলি করবো, যাও!

—এখানে তুই আর ক'দিন থাকিস্ দেখ্,—বলে আবার এক অট্টহাসি হেসে জটাধারী চলে গেল।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। রাতে ঘুমুতে পারলাম না। স্থির করে ফেললাম, এখান থেকে বদ্‌লি হবার জন্যে দরখাস্ত করবো।

সকাল বেলাই দরখাস্ত লিখে ফেললাম। দরখাস্ত নিয়ে নেপালী গেল পোস্টাপিসে। কিন্তু ঘণ্টাখানেক বাদেই সে ফিরে এলো। মাঝ পথে টেলিগ্রাফ পিওনের সঙ্গে দেখা। আমার নামে 'তার' আছে শুনে সে টেলিগ্রামটা নিয়ে এসেছে। পোস্টাফিস আর যেতে পারে নি।

আবার টেলিগ্রাম! বুকের মধ্যে ছাঁৎ করে উঠলো। যা ভয় করেছিলাম, ঠিক তাই—

—"কাল রাত্রে পিতা হার্টফেল করে মারা গেছেন, সত্বর চলে এসো!"

তখনই চলে এলাম।

সেই থেকে ক'দিন ধরে শুধু একটা কথাই মনে হচ্ছে, বাবা ও মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে জটাধারীর কোন যোগাযোগ আছে। তন্ত্র-শাস্ত্রে মারণ অভিচার প্রভৃতি ক্রিয়া আছে বলে শুনেছি, সেই রকম কোন ক্রিয়া ওই জটাধারী জানে! মায়ের মৃত্যুর আগের দিন সে বলেছিল, 'রিপোর্ট পরে দিবি, আগে নিজের ঘর সামলাগে যা!' বাবার মৃত্যুর আগের দিন বলে গেল, 'এখানে তুই আর ক'দিন থাকিস দেখ!' আর দু'দিনই সেই অট্টহাসি। ঠিক করে ফেলেছি, এবার বাদাম পাহাড়ে ফিরে গিয়েই জঙ্গলের মধ্যে জটাধারীকে গুলি করে মারবো। তারপর চাকরী ছেড়ে দিয়ে চলে আসবো। চাকরীতে আমার আর দরকার নেই। আমি বাইরে থাকলে এখানে বাড়ীঘর দেখার লোক নেই। এখনই চাকরী ছাড়তাম, কিন্তু ওই জটাধারীটাকে শেষ না করে চাকরী ছাড়তে পারছি না।

দিলীপ এই অবধি বলে চুপ করলো। ওর মুখের পানে তাকিয়ে ওর মাথার কোন গোলযোগ ঘটেছে বলে তো মনে হলো না। সে বোধহয় আমার কথাটা বুঝতে পেরেছিল, বললো—ভাবছ বোধহয় আমার মাথার মধ্যে কোন গোলযোগ হয়েছে, না?

বললাম—না, তা ভাবছি না, ভাবছি পিতৃবিয়োগে তোমার মন বড় চঞ্চল হয়ে পড়েছে।

—তুমি কেন, যে আমার কথা শুনবে সে-ই ওকথা বলবে তা আমি জানি। সেইজন্যই এসব কথা আমি আর কাউকে বলিনি। আর বলবই-বা কার কাছে? আচ্ছা, আমি এখন উঠি ভাই। বাদাম পাহাড় থেকে ঘুরে এসে আবার তোমার সঙ্গে দেখা করবো।

—তুমি কি সত্যি জটাধারীকে মারবে না কি?

—হ্যাঁ, আমার ধারণা ও তান্ত্রিক ক্রিয়া করে মাকে ও বাবাকে মেরেছে, তার প্রতিশোধ আমি নেব।

—কিন্তু খুন করে ধরা পড়লে ?

—সে মন্দিরে যদি দু-দশটা লোক খুন হয়ে পড়ে থাকে তাহলেও কেউ তার খোঁজ করবে না। দু'চার মাসে কেউ জানবে না। ততদিনে মড়া শেয়ালে খেয়ে যাবে।

দিলীপ আর কিছু বলতে দিলে না, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তান্ত্রিক অভিচার ক্রিয়ার কথা আমি বইয়ে পড়েছি। মারণ ও বাণ মারার কথাও শুনেছি, কিন্তু দিলীপের বাবার ও মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে জটাধারীর সত্যই এই ধরনের কোন যোগাযোগ আছে কি না তা নির্ণয় করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে শোকের আবেগে দিলীপ হঠাৎ একটা হত্যাকাণ্ডের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে এ আমি কোন মতেই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করতে পারলাম না। ভাবলাম দু-চার দিন পরে গিয়ে একে একটু বুঝিয়ে বলবো, যুক্তি তর্ক দিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করবো।

আজ যাই, কাল যাই করে কাজের ঝামেলা চুকিয়ে যাওয়া আর হয় না। শেষে রবিবার ছাড়া আর সময় হলো না। রবিবার দিন সকালে দিলীপের বাড়ী গিয়ে শুনলাম আগের দিন সে কর্ম-স্থানে চলে গেছে। শ্রাদ্ধ-শান্তি ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। আমার আর করার কিছু ছিল না, একটা দুঃসংবাদ শোনার আশঙ্কায় মনে মনে প্রস্তুত হয়ে রইলাম।

পাঁচদিন পরেই আপিসে বসেই সংবাদ পেলাম। খবরের কাগজের আপিসে কাজ করি, টেলিপ্রিণ্টারে অবিরাম খবর আসছে। খানিক খানিক টাইপ হচ্ছে আর পিওন ছিঁড়ে ছিঁড়ে এনে টেবিলের উপর রাখছে। যে যে সংবাদ পরের দিনে কাগজে ছাপা হবে, লাল কালি দিয়ে দাগ দিচ্ছি। খবর বাছাই করাই আমার কাজ। হঠাৎ একটা খবর আমার চোখে পড়লো : রাঁচীর বনবিভাগের কর্মচারী শ্রীদিলীপ আচার্যকে বনের মধ্যে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে গ্রাম্য লোকেরা পুলিশে খবর দেয়। রাঁচী হাসপাতালে তাকে স্থানান্তরিত করা হয়। তার দুটি হাতই

ভেঙে গেছে। তার সঙ্গে একটি বন্দুক ছিল, সে বন্দুকটি পাওয়া যায়নি। পুলিশ সন্দেহ করছে, কোন দুর্বৃত্ত তাকে আঘাত করে বন্দুকটি অপহরণ করেছে। কিন্তু দিলীপবাবুর চেতনা না হলে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ কিছু জানা যাবে না। দিলীপবাবুর এখনও জ্ঞান হয়নি।

মনটা চঞ্চল হয়ে উঠলো। জটাধারীর সঙ্গেই যে দিলীপের একটা কোন সংঘর্ষ হয়েছে সে সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ রইল না। রাঁচী যাবার বড় ইচ্ছা হলো, কিন্তু তখনই রাঁচী যাওয়া তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আহাঃ, বেচারা দিলীপের আপনার বলতে কেউ নেই!

রাত আটটায় বাড়ী ফিরে দেখি হরি বসে আছে। হরি দিলীপের বাড়ীর পুরানো চাকর। আমাকে দেখেই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো, বললো—বাবু, এই দেখুন, তার এসেছে, আপনাকে আমার সঙ্গে এখনি যেতে হবে, রাত দশটায় গাড়ী।

—যাওয়া বললেই কি যাওয়া যায়? টাকা চাইত।

—সব আছে, আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। রাত দশটার গাড়ী, আপনি তৈরী হয়ে নিন। আপনি ছাড়া ওর আর আত্ম-বন্ধু কেউ নেই বাবু। ছেলেটাকে আমি কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি।

আবার হাউ হাউ করে হরির কান্না।

যাবার ইচ্ছা ছিলই, টাকার কথাটা ভাবছিলাম, তাও যখন জুটে গেল, হরির সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম রাত দশটার ট্রেনে।

স্টেশন থেকে নেমেই বরাবর চলে গেলাম হাসপাতালে। হাসপাতালের ফটকে ঢুকেই চমকে উঠলাম। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসছে জটাধারী। মানুষটিকে চিনতে আমার মোটেই কষ্ট হলো না। দিলীপের মুখ থেকে ঠিক যেমনটি শুনেছিলাম। মাথার জটা নেমে এসেছে হাঁটুর নীচে অবধি, কপালে একটা লাল সিঁদুরের টিপ। চোখ দুটি লাল, পরণে গেরুয়া। হরিকে দেখেই সে চিনলো, আমার মুখের পানে তাকালো কট্‌মট্ করে। তারপর আমাকে লক্ষ্য

করে বললো—দেখতে এসেছিস ? কি দেখবি ? সব শেষ হয়ে গেছে !

আমি তার কথায় কান না দিয়ে তাকে পাশ কাটালাম। হাহা করে সে হেসে উঠলো আমার পিছনে। অদ্ভুত সে হাসি, তেমন হাসি আমি কখনও শুনি নি। হাসিটা এসে যেন বুকের মাঝে ধাক্কা মারে, সারা দেহ কেমন যেন শির শির করে ওঠে।

তাড়াতাড়ি আপিস-ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। জটাধারীর কথাই সত্যি, ডাক্তার বললো—এইমাত্র দিলীপবাবু মারা গেলেন ! ঘণ্টা-খানেক আগে এলেও দেখতে পেতেন।

—কলিকাতাথেকে আসছি, ট্রেন থেকে নেমেই সোজা চলে এসেছি।

—সে আর কি করবেন ? আপনি ওঁর কে ? এই মাত্র ওঁর গুরু এসেছিলেন, তিনি বললেন, দিলীপবাবুর আপনার লোক কেউ নেই।

—গুরু এসেছিলেন ? গুরু কে ? ওই জটাধারী তান্ত্রিক যাকে এখনই বেরিয়ে যেতে দেখলাম ?

—হ্যাঁ। উনি এসেছিলেন প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে। চব্বিশ ঘণ্টায় জ্ঞান হয়নি শুনে তিনি ওর মাথায় হাত দিয়ে ইষ্টমন্ত্র জপ করে জ্ঞান সঞ্চারের চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না। জপ শেষ করে তিনি হাত তুললেন আর কয়েক মিনিটের মধ্যে দিলীপবাবু মারা গেলেন। তন্ত্রমন্ত্রে কি আর কিছু হয় মশাই, মন্ত্রের সে শক্তি থাকলে ডাক্তারী শাস্ত্র মিথ্যে হয়ে যেতো !

আমি তো স্তব্ধ হয়ে গেলাম। দিলীপ যা বলেছিল তাতো অমূলক নয়। ওই জটাধারী তার মাথায় মারণ মন্ত্র জপ করে তাকে মারতে এসেছিল কি না কে বলবে !

যাক্, সে কথা ভেবে আর এখন কোন লাভ নেই। এ ব্যাপারের কোন প্রমাণ হয় না, প্রতিকারও করার নেই।

দু'দিন রাঁচীতে থাকতে হলো। মৃত্যুর কারণ সবিশেষ নির্ণয় না করে হাসপাতাল থেকে মৃতদেহ ছাড়লো না। মৃতদেহ পেলাম পরদিন। শ্মশানে গিয়ে দেখি জটাধারী দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখের পানে তাকিয়েই আমার কেমন যেন ভয় হলো, মনে হলো

সেখান থেকে চলে আসি। কিন্তু কাজ শেষ না করে তো আসতে পারি না।

অগ্নিসংকার শেষ না হওয়া অবধি সে চুপ করে চিতার পানে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সব শেষে হরি গঙ্গায় দেবে বলে অস্থি সংগ্রহ করছে এমন সময় সারা শ্মশান কাঁপিয়ে জটাধারী হেসে উঠলো, বললো—কি খুঁজছিস? কিছু নেই। সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে!

সত্যই অনেক খোজাখুঁজি করেও অস্থি পাওয়া গেল না। হরি হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো, বললো—মা গঙ্গায় দেবার মত অস্থিও পাব না!

জটাধারী হাহা করে হেসে উঠলো।

এবার আমি মুখ তুলে তাকালাম তার চোখের পানে। সেও তাকালো। কী ভীষণ সে চোখ, জ্বল জ্বল করছে লাল জবা ফুলের মত। এবার সে চোখের পানে তাকিয়ে আমার শুধু ভয়ই হলো না, কেমন যেন একটা ঘৃণাও হলো। একজন অনাত্মীয় যুবকের মৃত্যুর পর শ্মশানে দাঁড়িয়ে যে এমনভাবে হাসতে পারে, সে আর যাই হোক, মানুষ নয়।

আমার চোখের পানে তাকিয়ে আমার মনের ভাব বোধ হয় সে বুঝতে পারলো। মুখ ফিরিয়ে ধীরে ধীরে শ্মশান থেকে বেরিয়ে চলে গেল। দিলীপের মৃত্যুর সঙ্গে এই মানুষটির যে একটা কোন যোগাযোগ আছে সে সম্পর্কে আমার মনে এতটুকু সন্দেহ রইল না। সম্ভবতঃ দিলীপের পিতা-মাতার মৃত্যুর কারণও এই মানুষটি। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো কিছু নেই।

সেই রাত্রে কলিকাতায় ফিরলাম।

তারপর কয়েক বছর কেটে গেছে, কেউই জটাধারীকে আর কোথাও কখনও দেখিনি। দিলীপ বলেছিল, তাদের কলিকাতার বাড়ীতে সে আসতো, বাগবাজার থেকে টালিগঞ্জ অবধি আমি নিত্য যাতায়াত করি, কোনদিন পথে ঘাটে জটাধারীকে আমার চোখে পড়েনি। আর চোখে পড়লেই বা কি করতাম!

—এ কাজে সাহসের দরকার, অমাবস্যার রাত্রে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত শ্মশানে রাত্রিবাস করতে হবে, পারবে ?

স্তিমিত দীপালোকে তান্ত্রিক ভৈরবীর লাল চোখ দু'টি জ্বল্ জ্বল্ করে উঠলো। সেই গুহার মধ্যে থম্‌থমে অন্ধকারে মনে হলো দীপের চেয়ে ওই চোখ দু'টি যেন বেশী জোরালো।

যাকে লক্ষ্য করে তান্ত্রিক কথাগুলি বললো, এবার সে জবার দিল —পারবো।

—তুমি শিল্পী, শিল্পীর মন বড় দুর্বল।

—এখানে দুর্বলতার কোন কথা নেই, এখানে মর্যাদার প্রশ্ন। যেভাবেই হোক্ আমার মর্যাদা আমাকে রক্ষা করতেই হবে।

—বেশ, আমি সব ব্যবস্থা করবো। মহাকালীর কৃপায় তোমার সর্ব কামনা সিদ্ধ হবে। কিন্তু তুমি সেজন্য মায়ের প্রণামী কি দেবে ?

—কি দিতে হবে বলুন ?

—এই শিল্পীর মৃত্যু হলে, ওই মন্দির নির্মাণের ভার তোমার উপরেই বর্তাবে। তখন আমার এই গুহাটির উপর তোমাকে একটি মন্দির তৈরী করে দিতে হবে। মায়ের মহিমা প্রচারের জন্য একটি মন্দিরের প্রয়োজন।

—তাই দোব।

—উত্তম! বসো, আমি ব্যবস্থা করছি।

ভৈরবী গুহা থেকে বেরিয়ে গেল। প্রায়অন্ধকার গুহার মধ্যে কালীমূর্তির সামনে বসে রইল শিল্পী সুদর্শন। গুহার গায়ে একটি কালীমূর্তি খোদাই করা। বড় বড় দু'টি চোখ, লাল টক্‌টকে জিভ, সে চোখে তীব্র হিংসা, সে জিভে বহু প্রাণীর রক্তচিহ্ন। প্রদীপের স্তিমিত আলোয় প্রতিমার পায়ের কাছে ইস্পাতের খাঁড়া ঝক্‌ঝক্

করছে। চারিপাশে একটা গুমোট ভাব। সেখানে বসে থাকতে ইচ্ছা হয় না। মন হাঁপিয়ে ওঠে। গুমোট হাওয়া যেন মাথাটাকে চেপে ধরে। এক একটা মুহূর্ত মনে হয় যেন এক একটি দণ্ড।

ভৈরবী ফিরে এলো, হাতে কিছু মাটি। একপাশে নিভে আসা হোমকুণ্ড থেকে কিছু ছাই তুলে নিয়ে সেই কাদা-মাটির সঙ্গে মেখে ফেললো। তারপর জিজ্ঞাসা করলো—তার নাম ও গোত্র ?

—নাম সোমদত্ত, গোত্র জানি না। সোমনাথক্ষেত্রের লোক।

ভৈরবী আর কিছু বললো না, সেই মূর্তি দিয়ে একটি পুতুল গড়লো, মোটামুটি হাত-পা-ওলা একটি মাটির পুতুল। বিড় বিড় করে কিছুক্ষণ মন্ত্র পড়ে খাঁড়া থেকে খানিকটা সিঁদুর নিয়ে সেই পুতুলের মাথায় লেপে দিল, তারপর প্রতিমার পায়ে পুতুলটি ছুঁইয়ে সে সুদর্শনের হাতে দিয়ে বললো—কাল সারাদিন উপবাসে থেকে, রাত্রি দ্বিপ্রহরে শ্মশানে গিয়ে এই পুতুলটি অগ্নিকুণ্ডে অর্পণ করবে, তিনবার আগুনে তিনমুঠো যব আহুতি দিয়ে বলবে—'সোমনাথ ক্ষেত্রনিবাসী শিল্পী সোমদত্ত নিপাত যাক্ ওম্ স্বাহা!' তারপর তিনবার সেই চিতা প্রদক্ষিণ করে ফিরে আসবে। সেই মুহূর্ত থেকে সোমদত্ত অসুস্থ হবে, তৃতীয় দিন মধ্যরাত্রে তার মৃত্যু অনিবার্য।

সুদর্শন কম্পিত হস্তে পুতুলটি গ্রহণ করলো।

ভৈরবী বললো—কিন্তু মন্দির করে দেওয়ার অঙ্গীকার যেন মনে থাকে। অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে আমার অভিশাপে রক্তবমন করে তোমার মৃত্যু হবে।

সুদর্শন মুখ তুলে তাকালো। ভৈরবী হাহা করে হেসে উঠলো। মাথার দীর্ঘ জটা অস্ফুট আলোকে বড় বড় সাপের মত দুলে উঠলো। সুদর্শনের মনে হলো সেই হাসির ঝলক যেন তার বুকের মধ্যে ধাক্কা দিচ্ছে। প্রণাম করতে সে ভুলে গেল, শঙ্কিত পদে সে বেরিয়ে এলো গুহা থেকে।

অন্ধকারাচ্ছন্ন পাহাড়ী পথ। দু'পাশে ঘন বন। রাত্রি প্রথম প্রহর অতীতপ্রায়। এ পথে এ সময় কোন মানুষ থাকে না। সন্ধ্যার পরেই এ পথ জনশূন্য হয়ে যায়, বন্য জন্তুর ভয়ে এই পথে সন্ধ্যার আগেই যে যার কাজ সেরে ঘরে ফেরে। শিল্পী সুদর্শন লোকের দৃষ্টিকে এড়িয়ে যাবার জন্যই আজ রাত্রে এই পথে পা বাড়িয়েছে। সে যে খুব সাহসী তা নয়, কিন্তু আত্মমর্যাদায় চরম আঘাত পেয়ে সে-আজ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। কোষ থেকে তলোয়ার উন্মুক্ত করে নিয়ে সে দ্রুতপদে বনভূমি অতিক্রম করলো। একপাশে পাহাড়ী দেয়াল, আরেক পাশে খাদ, মাথার উপরে বন থেকে যে কোন মুহূর্তে বাঘ কি সাপ ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়তে পারে, তখন আর তলোয়ার কোষমুক্ত করার অবসর থাকবে না। সেইজন্য মুক্ত অসি হাতে নিয়ে সুদর্শন বনপথ অতিক্রম করলো।

বনভূমি পার হয়েই কয়েকখানি বাড়ী, তারপরেই বাজার। কোথাও কোন আলোর চিহ্ন নেই। সেই অন্ধকারের মধ্যেই নিজের বাড়ী চিনতে সুদর্শনের কোন কষ্ট হলো না। বাড়ীর পিছনের দ্বার অর্গলমুক্ত ছিল, সুদর্শন নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করলো।

চক্‌মকি ঠুকে সুদর্শন প্রদীপ জ্বাললো। দীপের আলোয় সে যেন একটু স্বস্তি পেল। রাত্রির অন্ধকার চারিপাশ থেকে তাকে যেন চেপে ধরছিল। দ্বার বন্ধ করে, হাতের পুতুলটি সে চোখের সামনে তুলে ধরলো। মাটি ও ছাই মেশানো একটা পুতুল, নিপুণতার কোন পরিচয় নেই। নেহাৎ একটি ছেলেভুলানো খেলনার মত। মাথায় খানিকটা সিঁদূর লেপে দিয়ে জিনিসটা আরো কিম্ভূতকিমাকার দেখাচ্ছে। সুদর্শনের মত প্রখ্যাত শিল্পী এই ধরনের কোন একটি পুতুল যে কোনদিন এমন ভাবে যত্ন করে হাতে তুলে নিয়ে দেখবে, একথা কেউ ভাবতেই পারে না। খাটিয়ার নীচে এক কোণে পুতুলটিকে সযত্নে রেখে সুদর্শন বেশ পরিবর্তন করে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো।

শুয়ে পড়লো বটে, কিন্তু ঘুম আসে না। জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকার আকাশের মিট্‌মিটে তারার পানে সে তাকিয়ে রইল।

সুদর্শনের বয়স আজ পঁয়তাল্লিশ। গুর্জরদেশের শিল্পী দিগম্বরের সে বংশধর। অত সম্মানীয় শিল্পীগোষ্ঠী এই অঞ্চলে আর কোন ঘর নেই। বংশ-পরম্পরায় বহু গুহা-মন্দির, কত পাথরের মন্দির এই বংশের শিল্পীদের পরিকল্পনায় তৈরী হয়েছে। রাজা-মহারাজা বা শ্রেষ্ঠীরা ধর্মের নামে কিছু গড়ে তুলতে হলেই শিল্পী দিগম্বরের বংশ-ধরদের আগে ডেকে পাঠিয়েছেন, তাঁরা যেখানে যেভাবে যে পরিকল্পনা করে দিয়েছেন, তাই সবার সেরা বলে প্রমাণিত হয়েছে, গৃহীত হয়েছে। কোনদিন কোন শিল্পী দিগম্বর বংশের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামেনি। অবশ্য দিগম্বর বংশের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাও সহজ কথা ছিল না। কিন্তু সেই ধারার এবার ব্যতিক্রম ঘটালো সোমনাথ-ক্ষেত্রের এক অখ্যাত শিল্পী সোমদত্ত।

এই অর্বুদ পাহাড়ে রাজমন্ত্রী তেজপাল ও বাস্তুপাল যখন শ্বেত-পাথরের জৈন মন্দির গড়তে চাইলেন, তখন সুদর্শন ছ'মাস ধরে যে পরিকল্পনা তৈরী করলো, তারই সঙ্গে পাল্‌টা পরিকল্পনা দিল, এই সোমদত্ত। দু'জনের পরিকল্পনারই তুলনামূলক আলোচনা হলো। এবং শেষ অবধি সুদর্শনের পরিকল্পনার কিছু কিছু অদলবদল হলো, সোমদত্তের পরিকল্পনা সেই স্থানে কার্যকরী করা হলো। সুদর্শন মনে মনে আহত হলো, কিন্তু শিল্পী হিসাবে সত্যকে মেনে নিতে হলো। স্বীকার করতে হলো সোমদত্তের পরিকল্পনা অনেক স্থানে তার চেয়ে ভালো হয়েছে। কিন্তু শিল্পীমন আহত হলো। শ্বেত পাথরের এই অপূর্ব মন্দির তৈরী আজ শেষ হয়েছে কিন্তু সবটুকু গৌরব আজ সুদর্শনের নয়, আজ সবাই বলছে, এ মন্দির পরিকল্পনা করেছেন দু'জন শিল্পী সুদর্শন ও সোমদত্ত। একের সম্মান আজ দু'ভাগ হয়ে গেছে।

এইখানেই যদি এ ব্যাপারের সমাপ্তি ঘটতো তবে কোন কথাই ছিল না। শিল্পীসভায় হঠাৎ একটা কথা উঠেছে। তেজপাল

ও বাস্তুপাল ভালো কাজ পাবার জন্য শিল্পীদের অজস্র অর্থ দিয়েছেন। কাজ ভালোই হয়েছে। এখন কথা উঠেছে, শিল্পীরা বেশী পয়সা পেয়ে, বেশী ভালো মন্দির তৈরী করেছে। শিল্পকে তারা বিক্রী করে, সাধকের মত নিষ্ঠা নিয়ে সাধনা করে না। তাদের নিষ্ঠা পয়সার মূল্য দিয়ে কেনা যায়। এই কলঙ্ক থেকে মুক্ত থাকতে হবে, নিজেদের চেষ্টায় শিল্পীরা এখানে এক মন্দির তৈরী করবে। কেউ কোন পারিশ্রমিক নেবে না। যে অর্থ তারা পেয়েছে তাতে দীর্ঘকাল খেয়ে পরেও অনেক উদ্বৃত্ত থাকবে। খালি পাথর আর মালমশলা কিনলেই চলবে। শিল্পীরা বিনা পয়সায় কয়েক বছর কাজ করে দেখিয়ে দেবে যে, শিল্পীরা শিল্পের কতটা উৎকর্ষ সাধন করতে পারে। তারা শিল্প বেচতে আসে অন্নের জন্য, কিন্তু শিল্পের সাধনা তারা করে, এবং সে সাধনার সবটুকুই তারা অন্নের জন্য বিক্রী করে না।

শিল্পীগোষ্ঠীর এই মন্দিরের পরিকল্পনা করার ভার পড়েছে দু'জনের উপর, সুদর্শন ও সোমদত্ত। দু'জনেই নিজ নিজ পরিকল্পনা শিল্পী-গোষ্ঠীকে দেখিয়েছে, কারও কারও মুখে একথাও শোনা গেছে, সোমদত্তের পরিকল্পনাই ভালো। তিন দিন পরে এই পরিকল্পনা সম্পর্কে শেষে আলোচনা হবে। কিন্তু সুদর্শন এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর সইতে পারছে না। সোমদত্তের এই প্রতিযোগিতা তার একার সঙ্গে নয়, শিল্পী দিগম্বরের বংশের সঙ্গে এই প্রতিযোগিতা, বিগত পাঁচশো বছরের মর্যাদার সঙ্গে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সুদর্শন এখন এই মর্যাদার একমাত্র ধারক। সুদর্শন এই বংশগৌরবকে কোন মতেই ক্ষুণ্ণ হতে দিতে পারে না, তাই মহাকালী মন্দিরের তান্ত্রিক ভৈরবীর সে শরণ নিয়েছে। মারণ মন্ত্রে সোমদত্তকে সে ধ্বংস করবে। তার নাম মুছে যাবে শিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যে থেকে।

চিন্তা করতে করতে সুদর্শনের মাথাটা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। সে রাতে তার এতটুকু ঘুম হলো না। ধীরে ধীরে উষালোক ফুটে উঠলো আকাশের গায়।

সারাটা দিন সুদর্শন ঘর থেকে বেরুলো না। একবার ভৃত্য

এসেছিল ঘর ঝাঁট দিতে, পাছে পুতুলটা তার চোখে পড়ে, সুদর্শন বললো—ঘর ঝাঁট দিতে হবে না, যা।

শিল্পীর ভৃত্য, শিল্পীর খামখেয়ালের সঙ্গে দীর্ঘকাল তার পরিচয়। বিনা বাক্যব্যয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সারাটা দিন সুদর্শন ঘরে বসে বসে মেঝের উপর খড়ি দিয়ে ছক্ কাটতে লাগলো। তখনকার দিনে কাগজ এতো সুলভ ছিল না, মেঝের উপর খড়ির ছক্ কেটেই শিল্পীরা অনেক কিছু পরিকল্পনা করতেন, তারপর একখানি কাগজে সেই ছক তুলে নিতেন। সুদর্শন নিজেকে ব্যস্ত দেখাবার জন্য এইভাবে ছক কাটতে লাগলো,—এলোমেলো, আজেবাজে ছক।

স্নানাহারের বেলা পার হয়ে গেল। ভৃত্য এসে ডাকলো—বাবু, বেলা যে অনেক হলো!

সুদর্শন বলে দিল—আজ আমি খাব না, শরীরটা ভালো নেই।

—একটু দুধ গরম করে দেবো?

—না, কিছুই আমি খাব না, পেটে সারারাত বেদনা হয়েছে, খানিক পরে একবার বৈদ্যের বাড়ী যাব।

কথাটা মিথ্যা। সুদর্শন ভৈরবীর নির্দেশমত সারাদিন উপবাস করতে চায়। পুরাতন ভৃত্যের কাছে একটি ছলের আশ্রয় না নিয়ে উপায় ছিল না।

দুপুরের দিকে সুদর্শন ঘুমিয়ে পড়েছিল, সারারাত ঘুমায়নি, দিনের ঘুম ভাঙলো একেবারে সেই সন্ধ্যাবেলা। সুদর্শন বেশ পরিবর্তন করে, উত্তরীয়ের মধ্যে পুতুলটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। এ সময় নখি তলাওয়ের পথে লোক চলাচল করে কম। তলাওয়ের পিছন থেকে গভীর অরণ্য বরাবর পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে নেমে গেছে। ওদিকটায় একা যেতে লোকে ভয় পায়। সুদর্শন নখি তলাওয়ের পথ ধরলো।

বাঁ হাতে উত্তরীয়ের আড়ালে পুতুলটি আছে। মাটির পুতুল। কাঁচা মাটি সারাদিন হাওয়া লেগে কাল রাতের চেয়ে আজ একটু

শক্ত হয়েছে। এই পুতুলটির মধ্যে ভৈরবী মন্ত্র পড়ে সোমদত্তের প্রাণ আকর্ষণ করেছে। চিতার আগুনে এটিকে উৎসর্গ করিলে সোমদত্ত নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে। মাত্র তিনটি দিন, তারপর শিল্পী দিগম্বর বংশের প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেউ থাকবে না। গুর্জরদেশে দিগম্বর বংশের মর্যাদা আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। সুদর্শন নির্মম উল্লাসে একটু হাসলো।

সুদর্শন নখি তলাওয়ের কিনারায় এসে বসলো। অর্বুদ পাহাড়ের উপর দেবতার প্রতিষ্ঠিত এই পুষ্করিণী। চারিপাশে পাহাড়, আর শ্যামল বনানী ঘেরা অপরূপ এর স্নিগ্ধতা। যে রাজ্যে সমতল ভূমিতেই অপর্যাপ্ত জল পাওয়া যায় না, সে দেশে পাহাড়ের উপর এই সুপেয় স্নিগ্ধ জলপূর্ণ পুষ্করিণী এখানকার এক অপরূপ বিস্ময়। এই তলাওয়ের ধারে কতদিন প্রত্যূষে সুদর্শন এসে বসেছে, কিন্তু আজকের মত সন্ধ্যার অন্ধকারে একাকী কখনও আসেনি। চারিপাশের অন্ধকার কেমন যেন ভীতির সঞ্চার করে। সুদর্শন যে একা সে কথাটা প্রতিমুহূর্তে সারা দেহের মধ্যে যেন সঞ্চারিত হতে থাকে। এখানে রাত্রিতে প্রথম প্রহর অবধি অতিবাহিত করে তারপর শ্মশানে যেতে হবে। সে শ্মশান অবশ্য বেশী দূরে নয়, তলাওয়ের ওপাশেই। সুদর্শন তলাওয়ের পাশে একটি গাছে হেলান দিয়ে বসে রইলো। তলোয়ার-খানি কোষমুক্ত করে রেখে দিল হাতের পাশেই।

ধীরে অতি ধীরে সময় বয়ে যায়। এপাশে ওপাশে মর্মর করে শুকনো পাতার শব্দ হয়। সুদর্শন তলোয়ারখানি চেপে ধরে চারিপাশের অন্ধকারটাকে ভাল করে দেখে নেবার চেষ্টা করে।

অসহনীয় অবস্থার মধ্যে দিয়ে সুদর্শনের সময় কাটতে থাকে। রাত্রি প্রথম প্রহরের শিয়ালের ডাক কখন শোনা যাবে সে তারই জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

শেষে সত্যই একসময় রাত্রিকে সচকিত করে শেয়াল ডেকে ওঠে। রাত প্রথম প্রহর শেষ হলো। সুদর্শন উঠে দাঁড়ালো। অন্ধকার পথ দিয়ে ধীরে সে অগ্রসর হলো শ্মশানের দিকে।

অন্ধকারে সেই পথে অতো রাত্রে কোন মানুষ ইতিপূর্বে হাঁটেনি। পথও বোধ হয় এই সময় এই মানুষের পদক্ষেপে বিস্মিত হয়েছিল, সুদর্শনের প্রতি পদক্ষেপের শব্দে প্রতিধ্বনি তুলে সে সচকিত হয়ে উঠছিল। চারিপাশ সজাগ করে তুলছিল।

উন্মুক্ত অসি হাতে সুদর্শন শ্মশানে এসে পৌঁছালো। এ সময়ে শ্মশানে কোন চিতার আগুন থাকার কথা নয়, কোথাও কোন আগুন সুদর্শনের চোখে পড়লো না। চক্‌মকি ও খানিকটা সোলা সে সঙ্গে করে এনেছিল। একটি গাছতলায় বসে সে আগুন জ্বাললো, তারপর তেলে ভেজানো একখণ্ড শুক্‌নো কাঠ বের করে সেটি জ্বেলে নিয়ে সে দেখে নিল। সামনেই একটি চিতা, তাতে অনেক পোড়া কাঠ ইতঃস্ততঃ ছড়ানো। সে আগুন দিল, সেই কাঠগুলি দিয়ে ধোঁয়া উঠতে সুরু করলো। একটু পরেই দু'তিনটে কাঠের মুখে আগুনের আভা দেখা দিল। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় দপ্‌ করে কাঠগুলি জ্বলে উঠলো।

এবার সুদর্শন আগুন দেখে মনে যেন একটু ভরসা পেল। হাতের পুতুলটা সেই আগুনের সামনে একবার তুলে ধরলো। সে পুতুলটাকে আর ঠিক মাটির পুতুল বলে মনে হলো না, মনে হলো ছোট পুতুলটা জীবন্ত হয়ে তার হাতের মধ্যে বুঝি কাঁপছে। পুতুলটার মুখের উপর শিল্পী সোমদত্তের মুখের অবিকল প্রতিলিপি। গোঁপটা কানের পাশ অবধি চলে গেছে, মুখে কাঁচাপাকা গালপাট্টা। বড় বড় দুই চোখ মেলে সে তাকিয়ে আছে সুদর্শনের মুখের পানে। সেই মুখের পানে তাকিয়ে সুদর্শনের ঈর্ষা ও বিদ্বেষ মুহূর্তমধ্যে ফিরে এলো।

পুতুলটাকে টিপে ধরে তর্জন করে উঠলো,—আজ তোমার শেষ। শিল্পী দিগম্বরবংশের মর্যাদা তুমি ক্ষুণ্ণ করতে চাও, আজ তোমাকে শেষ করে সে মর্যাদাকে আমি রক্ষা করবো। গুর্জরদেশে সুদর্শনের শিল্পী-খ্যাতি থাকবে অদ্বিতীয়—অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

সুদর্শন জ্বলন্ত কাঠগুলির উপর পুতুলটি ফেলে দিল, তারপর ধীরে

ধীরে উচ্চারণ করলো—সোমনাথ ক্ষেত্রের শিল্পী সোমদত্ত নিপাত যাক্। ওম্ স্বাহা।

ছোট পুতুলটাকে ঘিরে আগুনের শিখা ধ্বক্ ধ্বক্ করতে লাগলো। মনে হলো যেন বহুদূর অন্তরীক্ষ থেকে সে দেখছে চিতায় একটা মানুষ পুড়ছে। ও দেহ শিল্পী সোমদত্তের দেহ। সুদর্শন সেই পুড়ন্ত পুতুলের পানে তাকিয়ে আবার উচ্চারণ করলো—সোমনাথ ক্ষেত্রের শিল্পী সোমদত্ত নিপাত যাক্, ওম্ স্বাহা! সোমনাথ ক্ষেত্রের শিল্পী সোমদত্ত নিপাত যাক্, ওম্ স্বাহা!

তিন মুঠো যব সে আগুনে আহুতি দিল। দপ্ দপ্ করে চিতা জ্বলে উঠলো। উপরের জ্বলন্ত কাঠটা ভেঙে পড়লো, পুতুলটা পড়ে গেল আগুনের মধ্যে। সুদর্শনের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো। এবার সে চিতা প্রদক্ষিণ করার জন্য উঠে দাঁড়ালো।

এতক্ষণ সুদর্শন একান্তভাবে চিতার পানে তাকিয়ে ছিল, পিছনে একটি পাথরের আড়ালে একটা প্রকাণ্ড চিতাবাঘ কখন যে নিঃশব্দে এসে বসে ছিল সে তা টের পায়নি, টের পাওয়ার উপায়ও ছিল না। সুদর্শন ঠিক যে মুহূর্তে উঠে দাঁড়াতে গেল, সেই মুহূর্তেই বাঘটি লাফিয়ে পড়লো তার ঘাড়ের উপর। 'কঁক্' করে একটা শব্দ হলো শুধু। একটু পরেই দেখা গেল চিতাটা সুদর্শনের বুকের উপর দু' পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে। পরক্ষণেই দাঁত দিয়ে সে টুঁটি ছিঁড়ে দিল।.....

সকালবেলা কঠুরিয়ারা জঙ্গলে কাঠ কাঠতে যাবার সময় শ্মশানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখলো একটি লোক বাঘে-খাওয়া অবস্থায় পড়ে আছে। মাথাটা বাঘের কামড়ে চূর্ণ। কিছু চেনার উপায় নেই। পরা বেশ ভূষা ও তলোয়ার দেখে সবাই জানলো, এ শিল্পী সুদর্শনের দেহ। সে রাত্রে সুদর্শন কেন শ্মশানে গিয়েছিল, সে কথা ভেবে সবাই বিস্মিত হলো। কোন হেতু খুঁজে পেল না। জানতো শুধু মহাকালীর ভৈরবী, সে খবর শুনে হাহা করে হেসে উঠলো, সামনের হোমকুণ্ডের কাঠখানি আগুনের মধ্যে এগিয়ে দিয়ে বললো—মায়ের ভেদাভেদ নেই, মার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা! মা আমার করাল বদনা!

শিল্পী

নামকরা শিল্পী সমর সেন হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

একদিন সকালে প্রতিবেশীরা দেখলো শিল্পীর দরজা খোলা, স্টুডিওর আসবাবপত্র সব ঠিক আছে কিন্তু শিল্পী নেই।

পুলিশ এলো, পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করলো, ধ্বস্তাধ্বস্তি হুড়োহুড়ির কোন চিহ্ন কোথাও নেই, মানুষটি যেন স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ করে চলে গেছে, কোন কিছুর প্রতিই তার কোন আগ্রহ নেই।

বছর দুয়েক হলো শিল্পী এই অঞ্চলে এই নতুন বাড়িখানি তৈরী করে এসেছে। জমি দু'কাঠা হলেও ঘরের কোন বাহুল্য নেই। নীচে একখানি বড় হলঘর, পিছনে একখানি ছোট ঘর। হলঘরটি তার স্টুডিও, পিছনের ছোট ঘরখানি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ভাঁড়ার ঘর বলা চলে। দোতলাতেও ঠিক তাই। বড় হলঘরখানি শোবার ঘর, পিছনের ছোট ঘরখানি রান্না ও ভাঁড়ার। একজন শিল্পীর একা থাকার পক্ষে আর বেশী কি দরকার। সমরবাবু এখানে একাই থাকতেন, আত্মীয়-পরিজন কেউ নাই। বিবাহ করেননি।

আত্মীয়-পরিজন না থাকলেও, বাইরের মানুষকে আপনার করে নেবার মত মন শিল্পীর ছিল। বিকেলবেলা কোন ছোট ছেলের সঙ্গে দেখা হলেই একটা টফি তার নিশ্চয়ই মিলবে। আর রাত আটটার পরে জমবে তাসের আড্ডা। মানুষটি নিরুদ্দেশ হবার সঙ্গে সঙ্গে এই দুটোই বন্ধ হলো। ছোটরা ও বয়স্করা অভাব বোধ করতে লাগলো। একটা প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসতে লাগলো প্রত্যেকেরই মনে —মানুষটি গেল কোথায়, এমনভাবে ঘর খুলে রেখে চলে গেল কেন? কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর কারও জানা নেই, শুধু মানুষটি যে নেই— এই কথাটাই প্রত্যক্ষ হয়ে রইল।

শিল্পী সমর সেন নিরুদ্দেশ, সন্দেহজনক রহস্যপূর্ণ অন্তর্ধান। সহরের লোকের মুখে মুখে কথাটা ঘুরতে লাগলো। ছোট সহরে

এই ধরনের ঘটনা দৈবাৎ ঘটে। যখন একটা কিছু ঘটে তখন তার আলোচনা চলতে থাকে আরেকটা কিছু না ঘটা পর্যন্ত। সমর সেনের আলোচনাও চলতে থাকে।

কে সমর সেন? কি পরিচয়? কোথায় ছিল? এলো কোথা থেকে? এ খবর কেউ রাখতো না। শিল্পী-খ্যাতি তাকে যেন সবদিক থেকেই সম্পূর্ণ করে রেখেছিল। শিল্পীকে শিল্পী বলে জেনেই সবাইকার সবটুকু জানা হয়ে গিয়েছিল। তার উপর মানুষটির টাকা পয়সা ছিল, এবং মেজাজ ছিল দরাজ। প্রয়োজনে যার কাছ থেকে টাকা ধার পাওয়া যায় ও শোধ দিতে হয় না, তার অন্য পরিচয়ে দরকার কি? এমন একজন শিল্পীর নিরুদ্দেশ হওয়া সবাইকার আলোচ্য বিষয় তো হবেই।

কিন্তু টাট্‌কা আলোচনা যেমন জমে, বাসিকথা তেমন জমে না। সমর সেনের আলোচনাও তেমন বাসি হয়ে এলো, যা একদিন বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল তাই সাধারণ হিসাবে গা সহা হয়ে গেল একদিন।

দীর্ঘ দু'মাস কেটে গেল। কাগজে সরকারী বিজ্ঞাপন বেরুলো। কিন্তু সমর সেনের কোন আত্মীয়ের সন্ধান পাওয়া গেল না। সরকারী কর্তারা ঠিক করলেন, বাড়ীটি বিক্রি করে দিয়ে টাকাটা রাজ্যপালের যক্ষ্মা হাসপাতালে দিয়ে দেওয়া হোক। স্থানীয় লোকেরা বললো —যদি কোনদিন সমরবাবু ফিরে আসেন, তখন কি হবে? তার চেয়ে উপরের হলঘরটা সমরবাবুর শিল্প সাজিয়ে একটা প্রদর্শনী করে রাখা হোক্, আর নীচে হোক্ একটা সাধারণ পাঠাগার। সমরবাবু যেদিন ফিরে আসবেন, সব কিছুই ফিরে পাবেন।

এই বিতর্ক যখন দানা বেঁধে উঠেছে, সেই সময় একদিন একটি লোক এসে দাবী জানালো—আমি সমর বাবুর ভাই, এই বাড়ী আমি দাবী করছি।

প্রশ্ন উঠলো—এতদিন আপনি কোথায় ছিলেন?

—চুপ করে ছিলাম।

—কেন?

—বাড়ী আমি চাইনা বলে। এখনও ও বাড়ী আমি চাই না। বাড়ীখানা দখল নিয়ে বাড়ীটা আমি সাফ করবো। তারপর স্থানীয় লোকেদের দান করে দেব লাইব্রেরী করার জন্য।

—বাড়ী সাফ করার কিছুই নেই, নতুন বাড়ী আমরা পরিষ্কার করেই রেখেছি। সেদিক থেকে আপনার দুশ্চিন্তার কিছুই নেই। আপনি সরকারী দপ্তরখানায় গিয়ে আপনার অধিকার প্রমাণ করুন, তাহলেই আপনি বাড়ী পেয়ে যাবেন।—স্থানীয় থানার অধ্যক্ষ বললেন।

আগন্তুক হাসলো, বললে—বাড়ীখানা আপনারা ধুলো ঝেড়ে পরিষ্কার করে রেখেছেন, কিন্তু আসলে পরিষ্কার করেননি। আমাকে আসল পরিষ্কার করতে হবে। সে কাজ সরকারী দপ্তরখানার কাজ নয়, সে কাজ আমার, আর তার সঙ্গে আপনার।

ইনেসপেকটারবাবু মুখের পানে জিজ্ঞাসু চোখ তুলে তাকালেন, বললেন—কি, চোরাই মালটাল আছে নাকি?

—হ্যাঁ, চোরাই মাল বটে, তবে সে জিনিস নয়, মানুষ।

—মানুষ?

—হ্যাঁ মানুষ, মানে ছোট ছেলে।

—ছোট ছেলে দু'মাস ওই বাড়ীতে আছে আর আমি জানি না? পাগলের কথা!

—জ্যান্ত নয়, মরা। তবে ক'জন আছে জানিনা। আপনারা সঙ্গে গেলে পরীক্ষা করে দেখতে পারি।

লোকটি পাগল নয়তো? ইনেসপেকটারের সন্দেহ হলো।

—আপনি বোধ হয় ভাবছেন আমি পাগল!—আগন্তুক বললো —কিন্তু আমার সঙ্গে গেলে আমি এখনই প্রমাণ করে দোব। অন্ততঃ একটা প্রমাণ আমার জানা আছে।

—বেশ চলুন, ইনেসপেকটার উঠে পড়লেন।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই দেখা গেল, ইনেসপেকটার কালিদাসবাবু সমর সেনের বাড়ীর চাবি খুলছেন, সঙ্গে সমরবাবুর ভাই সমীর আর দু'জন কনস্টেবল।

নীচের হলঘরখানি আগাগোড়া শিল্পীর সাজানো স্টুডিও। মূর্তি-শিল্পীর হাতে গড়া ব্রোঞ্জের মূর্তি সব। ইলেকট্রোপ্লেটিংয়ের জন্য ঝক্ ঝক্ করছে। সবই শিশুর মূর্তি। ঘরের মাঝে একখানি পাথরের টেবিল, দু'টি ছেলে দু'হাত তুলে টেবিলখানি ধরে আছে। চার কোণে চারটি আলো, চারটি ছেলে পিদিম হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পিদিমের উপর লাগানো রয়েছে চারটি ইলেকট্রিকের ডুম। দু'টি ছেলে ধরে আছে কাঠের একখানি তক্তা, সেইটি দু'জনের বসার মত বেঞ্চি। একপাশে একটি মেয়ে শাঁখ বাজাচ্ছে, শাঁখটি একটি এ্যাশ্‌ট্রে। সামনের দেওয়ালে একটি ছোট যীশুর মূর্তি, তার নীচেই একখানি সাদা পাতের উপর কালো অক্ষরে লেখা আছে: শিশুদের আমি ভালবাসি, সরল মন ও নির্মল চরিত্রের জন্য ভগবান তাঁদের ভালবাসেন। স্বর্গে তাদেরই অধিকার।

শিশুমূর্তি ছাড়া ছোটদের রকমারী খেল্‌না দিয়ে ঘর ভর্তি। সব খেল্‌নাই হাতে গড়া, নারকেলের মালা, বাদামের খোলা, বাঁশের টুকরো দিয়ে সব তৈরী। সমর সেনের শিশু-প্রীতি ছড়িয়ে আছে ঘরখানির সর্বত্র।

ইনেসপেকটার প্রশংসমান দৃষ্টিতে চারিপাশে তাকিয়ে বললেন —এই তো একখানা ঘরের বাড়ী, নীচে স্টুডিও আর উপরে শোবার ঘর, একি মরা ছেলে লুকিয়ে রাখার জায়গা? দু'মাস কোথাও মড়া থাকলে পচে দুর্গন্ধ বেরুতো না?

সমীরবাবু বললেন—পচলে নিশ্চয়ই দুর্গন্ধ বেরুতো।

—তবে?

—আমি বাজে কথা বলেছি।

—আমি তা জানি।

—না, আপনি জানেন না, এবং আমি বাজে কথাও বলিনি—দৃঢ় স্বরে সমীরবাবু বললেন—আপনি দাঁড়ান আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। সমীরবাবুর হাতে একটা ব্যাগ ছিল, ব্যাগটি খুলে তিনি তার ভিতর থেকে একটি হাতুড়ি বের করলেন, বললেন—প্রথমেই সুরু করা

যাক, শাঁখ বাজানো এই মূর্তিটি নিয়ে। কারণ এই মূর্তিটির ব্যাপারটা আমি জানি। কেমন ছোট ফুটফুটে মেয়েটি শাঁখে ফুঁ দিচ্ছে, ওই শাঁখটি এ্যাশট্রে, সিগারেট খেয়ে ওই শাঁখের মধ্যে আপনি সিগারেটের ছাই ফেলবেন। ওই মেয়েটি আমাদের কোন্নগরের এক গরীব প্রতিবেশীর মেয়ে, আর পাঁচটা ছোট ছেলেমেয়ের মত সে-ও আমাদের বাড়ীতে আসতো দাদার কাছ থেকে টফি ও লজেন্স খাবার লোভে। তারপর একদিন সে নিখোঁজ হয়ে গেল। দাদা তার বাপ-মাকে কত সহানুভূতির কথা বললেন। তারপর তাদের সেই মেয়ের স্থায়ী মূর্তি তৈরী করলেন—এই শঙ্খবাদিনী। মেয়েটির বাপ-মা এই মূর্তি দেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো। সমস্ত কোন্নগরে ছড়িয়ে পড়লো দাদার সুখ্যাতি। কিন্তু কেউ বিন্দুমাত্র ধারণা করতে পারেনি যে এই মূর্তির জন্যই মেয়েটি নিখোঁজ হয়েছে। মেয়েটিকে স্মরণ রাখার জন্য এই মূর্তি তৈরি হয়নি, মূর্তিটির পরিকল্পনা হয়েছে আগে, মেয়েটি নিখোঁজ হয়েছে পরে।

সমীরবাবু ইনেস্‌পেকটারের মুখের পানে তাকালেন। কালিবাবু এই অবান্তর কাহিনী শুনে কিছুটা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন। তা তাঁর মুখের ভাবেই বোঝা গেল।

সমীরবাবু বললেন—আপনি মনে করছেন আমি অবান্তর বকছি? আমার একটা কথাও অবান্তর নয়, আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।

সমীরবাবু সজোরে হাতুড়ির আঘাত করলো মূর্তির হাতের উপর।

মূর্তির ডান হাতখানি মট করে ভেঙে গেল। সেইটি তুলে নিয়ে সে ধরলো ইনেস্‌পেকটারের সামনে। কালিবাবু দেখলেন এনামেল-প্লেটিংয়ের ভিতরটা ফাঁপা, তার মধ্যে একখণ্ড বাহুর অস্থি।

সমীরবাবু হাতখানি নেড়ে চেড়ে দেখিয়ে বললেন—দেখছেন এখানা একটি শিশুর হাড়। এই মূর্তির এনামেল প্লেটিং হয়েছে একটা সত্যিকারের রক্ত-মাংসের দেহের উপর। এবং এই দেহটি কার জানেন, সেই হতভাগ্য নিরুদ্দিষ্টা মেয়েটির।

কালিবাবু অনেকদিন ধরে পুলিশের চাকরি করছেন, সহকারী

দারোগা থেকে ধীরে ধীরে তিনি আজ ইনেস্‌পেকটার হয়েছেন। বহু হত্যা বহু ধরনের গুমখুন ও নরহত্যার খবর তিনি জানেন, কিন্তু এমন অদ্ভুত বীভৎস ব্যাপার তিনি কল্পনা করতেও পারেননি।

সমীরবাবু বললেন—আমি সমস্ত মূর্তিটা ভেঙে ভেঙে দেখাতে পারি, এর মধ্যে একটা শিশুর কঙ্কাল আছে, কিন্তু তার আর কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

—না, না, আর ভাঙার দরকার নেই—কালিবাবুর মুখে এবার কথা ফুটলো।

—এই একটার কথাই আমি জানতাম তাই সেইটাই আমি আপনাকে প্রথম দেখালাম। আমার ধারণা সব কয়টি মূর্তিই এই রকম। আরেকটা ভেঙে দেখি।

চার কোণে প্রদীপ হস্তে চারটি মূর্তি ছিল, তারই একটা সমীরবাবু ঘরের মাঝখানে নিয়ে এলেন। একটি বালক দু'হাতে একটি পিদিম ধরে আছে। সমীরবাবু তার এক কাঁধে হাতুড়ির ঘা মারলেন। কাঁধ থেকে হাতখানি ভেঙে পড়লো। দেখা গেল সেটিও আগেরটির মত, ভিতরটা ফাঁপা, মধ্যে একখানি অস্থি।

এবার সমীরবাবু ঘরের মধ্যে মূর্তিগুলি গুনলেন, মোট তেরোটি। বললেন—এক শয়তানের খেয়ালে এই তেরোটি শিশু অকালে প্রাণ হারিয়েছে। এবং সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে, এই শিশুহন্তা শয়তান আমার সহোদর ভাই।

কালিবাবু এবার বললেন—আপনি যদি এসব জানতেন তাহলে আমাদের আগে জানাননি কেন?

—যেদিন জেনেছি, সেইদিনই সব শেষ, আর জানাবার দরকার হয়নি। সব শুনলেই আপনি বুঝবেন।

সমীরবাবু তাঁর কাহিনী সুরু করলেন।—

ছবি আঁকা ও মূর্তি গড়ার ঝোঁক সমরের ছেলেবেলা থেকেই। স্কুল ফাইন্যাল পাস করার পর আর্ট স্কুলে ভর্তি হবার সে উদ্যোগ করছে, এমন সময় বাবা মারা যেতে তাদের জীবনধারা ওলোট পালোট

হয়ে গেল। সমরকে যেতে হলো কারখানায় চাকরি করতে। সেখানে সে লেদ মেসিনের কাজ শিখলো আর শিখলো ইলেকট্রো-প্লেটিং। শিল্পী হিসাবে নামকরার ঝোঁক তখনও তার কাটেনি। হাতের কাছে যখনই যা পেত ইলেকট্রোপ্লেটিং করে এনে ঘর সাজাতো। পাড়ার ছেলেমেয়েদের খেল্‌না পুতুল ছুরি-কাঁচিও অনেক সময় ইলেকট্রোপ্লেটিং করে এনে দিত। এজন্য ছুটির দিনে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এসে নানা জিনিষ তার কাছে জমা দিত। দেখতে দেখতে সমর ছোটদের অত্যন্ত আপনার জন হয়ে উঠলো।

কষ্টে-সৃষ্টে দিন কাটছিল, হঠাৎ সমরের বরাত ফিরে গেল লটারিতে বত্রিশ হাজার টাকা পেয়ে। বললো—'আমি এবার নিজে স্টুডিও করবো, শিল্প সাধনা করবো ঘরে বসে।' তারপরেই এই জমি কিনে সে এই বাড়ী তৈরী করলো। চাকরি ছেড়ে দিয়ে এইখানে সুরু করলো তার শিল্পকর্ম। মায়ের হাতে নগদ দশ হাজার টাকা দিয়ে বললো—এইখানে ঘর বানাও, ভাড়া দাও। আমি তো আর টাকা দিতে পারবো না, ভাড়ার টাকা থেকে তোমরা চালাবে। আমার জন্য কিছু ভেবো না, আমারটা আমি কোন রকমে চালিয়ে নোব।' সমর একা এই বাড়ীতে বসবাস শুরু করলো।

ছুটির দিন পড়লেই প্রায় সে কোন্নগরে যেতো, পাড়ার ছেলেমেয়েদের জন্য টফি ও লজেন্স নিয়ে যেতো। সন্ধ্যা অবধি তাদের সঙ্গে খেলাধুলায় কাটিয়ে আসতো। ইতিমধ্যে কোন্নগরে ছেলে হারানো সুরু হলো। দু-এক মাস পরপর এক একটি ছেলে হারিয়ে যায়। কোথায় যে কে ধরে নিয়ে যায়, আর সন্ধান পাওয়া যায় না। ছেলেমেয়েদের বাবা-মায়েরা সদাই শঙ্কিত হয়ে আছেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলা কলিকাতার পথ-ঘাট জলে ডুবে গেল। বিকাল থেকে এমন বৃষ্টি নামলো যে তার বিরাম নেই। অফিস থেকে বেরিয়ে কোনমতে তো হাওড়া গিয়ে পৌঁছলাম, কিন্তু সেখানেও দুর্ভোগ। বিদ্যুৎ সরবরাহের গোলমালে ট্রেন অচল। ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করে শেষে বিরক্ত হয়ে স্থির করলাম আজ আর ফিরবো না,

দাদার বাসাতে থাকবো। আধঘণ্টা হেঁটে শিবপুর দাদার বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছলাম। পথ থেকে দোতলার ঘরের অনেকখানি দেখা যায়। চোখে পড়লো একটা রঙীন ফ্রক পরা ছোট মেয়ের সঙ্গে দাদা বসে বসে গল্প করছে। মেয়েটা কে? কার মেয়ে?

সদর দরজা বন্ধ ছিল, কলিং বেল দিতে দাদার সাড়া পেলাম কিন্তু নীচে নেমে এসে দরজা খুলে দিতে তার প্রায় পাঁচ মিনিট সময় লাগলো। বললাম—আজ আর বাড়ী ফিরতে পারবো না, এইখানেই থাকবো।

দাদার মুখের ভাবটা অপ্রসন্ন হয়ে উঠলো। বললো—কেন? আজকে কি?

—কারেন্ট ফেল্ করেছে, ট্রেন চলছে না। কখন যে চলবে তারও কোন ঠিক নেই। একঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে চলে এলাম।

—কিন্তু এখানে খাওয়া-দাওয়ার তো কোন ব্যবস্থা নেই। আমি তো একেবারে খেয়ে এসেছি। তুই তাহলে কিছু খাবার কিনে নিয়ে আয়।

—পরে যাব 'খন।

—না। বার বার জলে ভেজার দরকার নেই, একেবারে কিনে নিয়ে এসে ঘরে ঢোক্।

দাদার এই ব্যবহারটা ভালো লাগলো না, বাড়ীতে ভিজে জামা কাপড় বদলে খানিক পরে খাবার কিনতে বেরুলে কি এমন ক্ষতি হতো। যাক্ গে, তখনই আবার খাবার কিনতে গেলাম। কয়েক খানি পুরী কিনে নিয়ে ফিরে এলাম মিনিট পনেরোর মধ্যে। এবার দাদা আমাকে বরাবর উপরের ঘরে নিয়ে গেল। বললো—তুই ওপরেই থাক, বইটই পড়, আমি ততক্ষণ নীচে বসে খানিক আঁকা-জোকার কাজ করি। একটা নূতন মূর্তির পরিকল্পনা আঁকতে হবে।

মনে হলো মেয়েটার কথা জিজ্ঞেস করি, কিন্তু দাদা যখন নিজে থেকেই কোন কথাই বললো না, তখন আর সে কথা তুলি কেন?

দাদা নীচে নেমে গেল, আমিও হাত মুখ ধুয়ে জামাকাপড় বদলে একখানা মাসিক পত্রিকার পাতা উলটাতে সুরু করলাম।

ঘণ্টা দুয়েক পরে দাদা একেবারে উপরে এলো, বললো—এবার খেয়ে-দেয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়। আমার হাতের কাজ শেষ হতে অনেক দেরী আছে।

দাদা আবার নীচে নেমে গেল। আমিও খাওয়া ও শোয়ার উদ্যোগ করলাম।

মাথার দিকের জানালাটা বন্ধ করিনি। রাত্রে কোন সময়ে জোরে বৃষ্টি সুরু হয়েছিল, গায়ে জলের ছাট এসে লাগতেই ঘুম ভেঙে গেল। জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে আবার শুতে যাচ্ছি, এমন সময় একটা কান্নার আওয়াজ কানে এলো। কোথায় কে কাঁদছে। আলো জ্বাললাম। টেবিলের উপর ঘড়িতে দেখলাম রাত দুটো। তখনও দাদা শুতে আসেনি। বাইরে বেরিয়ে এলাম। নীচের ঘরে আলো জ্বলছে। দাদা কি কাজ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লো না কি? নীচে নেমে এলাম। ঘর খালি। আলো জ্বলছে বটে, কিন্তু ঘরে মানুষ নেই। দরজা-জানালা বন্ধ, এদিকে-ওদিকে তাকালাম, কাউকে দেখতে পেলাম না। এই বৃষ্টির মাঝে কেউ তো উঠানে বা ছাদে বেড়াবে না, তবে? ভাবলাম একবার ডাকি কিন্তু কোথায় যেন খুট্ খুট্ করে একটা শব্দ শুনলাম। মনে বড় কৌতূহল হলো। দ্রুত উপরে উঠে এসে আলোটা নিবিয়ে দিয়ে অন্ধকারে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কয়েক মুহূর্ত পরে সিঁড়ির নীচে একটা আলোর ঝিলিক দেখা গেল। তারপরেই দেখি দাদা বেরিয়ে আসছে সিঁড়ির আড়াল থেকে। সে উপরেই আসছে দেখে তাড়াতাড়ি এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। দাদা উপরে এলো, আলো জ্বেলে দেখলো আমি যথারীতি ঘুমুচ্ছি। দেখে সে আবার নীচে নেমে গেল। আমিও আবার উঠে এলাম বারান্দায়। মানুষটিকে দেখা গেল না, ছায়া দেখে বুঝলাম, নীচের ঘরে সে পায়চারি করছে।

দেখতে দেখতে রাত তিনটে বাজলো, দাদা ঘর থেকে বেরুলো, সিঁড়ির নীচে চলে গেল, আবার এক ঝলক আলো দেখা গেল সিঁড়ির নীচে তারপর আবার সব অন্ধকার। আমিও সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলাম। অন্ধকারে ভালো করে ঠাহর করবার চেষ্টা করলাম, একটা দরজা রয়েছে বটে। সামান্য ঠেলতেই দরজাটি একটু ফাঁক হলো, বাথরুমের দরজা। কিন্তু বাথরুমে তো কেউ নেই। আলোটা শুধু জ্বলছে। উঁকি মেরে দেখলাম, উঠানের দিকে বাথরুমের যেটা সামনের দরজা সেটা বন্ধ। মানুষটি বাথরুমে ঢুকলো কিন্তু গেল কোথায়? আমি এবার সাহস করে ঢুকে পড়লাম বাথরুমের মধ্যে।

মিনিট দুই-তিন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। এই বাথরুম থেকে একটা মানুষের উবে যাওয়ার তো কথা নয়। তাহলে দাদা গেল কোথায়? রীতিমত সন্দেহজনক ব্যাপার। স্নানের ঘর। মেঝে থেকে দেয়ালের অর্ধেক পাথরের টালি, উপরের চুণকাম করা শাদা দেয়াল। এখান থেকে মানুষ উবে যায় কি করে? তবে হ্যাঁ, ঘরের মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে, দেয়ালের গায়ে বড় একখানা আয়না। চুল আঁচড়ানো ও দাড়ি কামানোর জন্য এতবড় একখানা আয়না কেন? এই আয়নাটাই একটা দরজা নয়তো?

আয়নার কাছে গিয়ে ঠাহর করে দেখতেই একপাশে একটা কড়া চোখে পড়লো, কড়াটা ধরে টানতেই ধীরে ধীরে আয়নাটা দরজার পাল্লার মত এগিয়ে এলো। পিছনে সত্যই এক সুঁড়ি-পথ। অন্ধকার। শুধু কয়েকটা সিঁড়ি নীচে নেমে গেছে। নীচে নামবো কিনা—ভয় হলো, কৌতূহলও হলো। শেষে চুপি চুপি সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচে একবার উঁকি মারাই ঠিক করলাম। নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে নেমে গেলাম নীচে।

নীচে আলোক-উজ্জ্বল একখানি ঘর। সিঁড়ির উপর থেকে ঘরের সবটুকু দেখা যায় না। একটা চৌবাচ্চা দেখতে পেলাম।

তার মধ্যে পীতাভ জল। যে জল আমি চিনি, সাইনাইড ও কপার সালফেটের আরক, প্লেটিংয়ের জন্য দরকার হয়। সিঁড়ির

দিকে পিছন ফিরে দাদা কি যেন করছিল, কোন দিকে তার খেয়াল ছিল না। ভাল করে তাকিয়ে দেখি একটি শিশুর দেহে সে কি মাখাচ্ছে। পাশেই একটা ফ্রক পড়ে আছে। ওই ফ্রক পরা ছোট্ট মেয়েটাকেই তো দেখেছিলাম পথ থেকে দোতলার ঘরে, দাদার সঙ্গে গল্প করতে। মেয়েটির পায়ের দিকটা দেখা যাচ্ছিল, দেখলাম পা মৃতের মত বিবর্ণ। মেয়েটি মারা গেছে। তাহলে খানিক আগে যে কান্নার শব্দ পেয়েছিলাম সে কি ওই মেয়েটিরই শেষ কান্না? মাথার মধ্যে গোলমাল হয়ে গেল।

কতক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম জানি না। দাদা অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে সেই শিশুর সর্বাঙ্গে একটা প্রলেপ মাখালো, তারপর একটি কাঠের ফ্রেমে সেটিকে একটি নাচের ভঙ্গিতে সাজালো। ফ্রেমে অনেক হুক লাগানো ছিল, সরু তার দিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে দেহটি বাঁধালো। ফ্রেমটি দাঁড় করিয়ে দিতেই আমি বুঝতে পারলাম, দেহটির সর্বাঙ্গে গ্রাফাইট্ মাখানো হয়েছে। এবার এ্যাসিডে ডুবিয়ে ইলেকট্রিক চার্জ করলেই, গ্রাফাইটের প্রলেপটা ধাতুতে রূপান্তরিত হবে। তখন তার উপর চলবে নিকেল প্লেটিং। তৈরী হবে মূর্তি। কি পৈশাচিক ব্যাপার!

মাথা ঘুরে গেল। বোধ হয় সেই অসতর্ক মুহূর্তে হাত পায়ের বা, নিঃশ্বাসের কোন আওয়াজ হয়েছিল, তাই শুনে দাদা চকিতে ঘুরে দাঁড়ালো, বললো—কে? কে?

—আমি।

—কে আমি?

—সমীর।

—সমীর! বলে দাঁত খিঁচিয়ে মেঝের উপর থেকে একটি হাতুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে সে ছুঁড়ে মারলো আমার পানে। অল্পের জন্য আমি রক্ষা পেলাম। ক্ষিপ্রপদে উঠে এলাম সিঁড়ি দিয়ে। কিন্তু দরজা দিয়ে বাথরুমে আসার আগেই দাদা আমার একখানা পা ধরে ফেললো। নিদারুণ ভয়ে প্রচণ্ড বেগে এক লাথি মারলাম। সে সুড়ঙ্গের সিঁড়ি

দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল। পরক্ষণেই ছপাৎ করে একটা শব্দ হলো আর একটা আর্তনাদ। পিছন পানে তাকিয়ে দেখি সিঁড়ির নীচে এ্যাসিডের চৌবাচ্চার মধ্যে সে পড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি নেমে এলাম। সাইনাইডের আরকের মধ্যে তখন দাদার অন্তিম মুহূর্ত। আমার চোখের উপর বার কয়েক হাত পা ছুঁড়ে সে স্থির হয়ে গেল। আমি কিছুই করতে পারলাম না। সেই আরকের মধ্যে খালি হাতে তাকে তোলা যায় না। তুলেও লাভ নেই। কি যে করবো আমি কিছুই ঠিক করতে পারলাম না।

কাঠের ফ্রেমটার উপর নজর পড়লো। আগে দেখতে পাইনি। এবার মেয়েটির মুখের পানে তাকিয়ে দেখি মুখখানা গ্রাফাইটে কালো হয়ে গেছে, তবু সে মুখ আমার চেনা, সে কোন্নগরের আমার প্রতিবেশী দেবীবাবুর ছোট মেয়ে গৌরী।

চৌবাচ্চার পানে তাকিয়ে দেখি দাদার মুখখানা তখন যন্ত্রণায় বীভৎস হয়ে উঠেছে।

মাথার মধ্যে শিরশির করে উঠলো, মনে হলো তখনই বুঝি মাথা ঘুরে পড়ে যাবো। কোনমতে বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে। সেই মুহূর্তে সেই বাড়ী ত্যাগ করলাম। ভিজতে ভিজতে গেলাম হাওড়া স্টেশনে। সেখানে রাতটুকু কাটিয়ে ভোরের ট্রেনেই বাড়ী ফিরলাম।

বাড়ী ফিরেই শুনলাম, আগের দিন সন্ধ্যা থেকে গৌরীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বুঝলাম সবই, কিন্তু মুখ ফুটে কাউকে কিছু বললাম না। সেইদিন থেকেই জ্বর, প্রায় দেড়মাস শয্যাশায়ী ছিলাম। ভেবেছিলাম, ইতিমধ্যে পুলিশ সব বের করে ফেলবে কিন্তু এখন দেখছি তারা কিছুই বুঝতে পারেনি।

সমীরের কাহিনী শুনে কালীবাবু বললেন—তখনই আপনার পুলিশে জানানো উচিত ছিল।

—আমার তখন মাথার ঠিক ছিল না—সমীর বললো,—সুস্থ থাকলে হয়তো পরদিন পুলিশে আসতাম, কিন্তু জ্বরে আমি শয্যাশায়ী

হয়ে পড়েছিলাম, হুঁস ছিল না। দেহে একটু বল পেয়েই আমি এদিকে খোঁজ নিতে এসেছি।

ইনেস্‌পেক্টর কালিবাবু বললেন—বেশ, চলুন, এখন গিয়ে দেখি আপনার সেই ঘর কোথায় ?

সমীর কালিবাবুকে সঙ্গে নিয়ে বাথরুমে ঢুকলো।

তারপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। নীচের ঘরে দুটি মৃতদেহ পাওয়া গেল। দেহগুলি এই কয়দিনে বিকৃত হয়ে গেছে।

সমরের স্টুডিও থেকে সমস্ত মূর্তিগুলিও পুলিশ অপসারিত করলো।

কয়েক গাড়ী রাবিশ এনে পুলিশ নীচের ঘরটা ভরাট করে দিল। কিছু দিনের মত একটা পুলিশ-ব্যারাক হলো সেই বাড়ীতে।

বুকের গুলি

রায়নগরের চৌধুরীদের বাড়ীতে ভূত দেখা দিল। যে ঘরে সদাশিববাবু থাকতেন সেই ঘরে মাঝরাতে প্রায়ই মানুষের চলাফেরার শব্দ পাওয়া যায়। বড় বৌ তো একদিন রাত্রে ঘরে ঢুকে স্পষ্ট দেখতে পেলেন সদাশিববাবু চেয়ারের উপর বসে আছেন। এর আগে দু'একজন চাকরও নাকি দেখেছিল, সেই থেকে সন্ধ্যার পর বাড়ীর ওদিকের মহলে কেউ আর ঘেঁষে না।

বিধবা স্বামীর শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করালেন, তান্ত্রিক লাগালেন কিন্তু সদাশিববাবুর আত্মার কোন সদ্‌গতি করাতে পারলেন না।

জমিদার বাড়ীর ব্যাপার টাকা-পয়সার অভাব নেই, যখন কিছুতেই কিছু হলো না, তখন বড় বৌ বললেন—যিনি এই আত্মার সদ্‌গতি করতে পারবেন তাঁকে দু'শো টাকা প্রণামী দেওয়া হবে।

কিন্তু তখন তান্ত্রিকেরা হাল ছেড়ে দিয়েছে।

এই ভূত দেখা দেবার আগের একটা ছোট ইতিহাস আছে। রায়নগরের জমিদারীর মালিক ছিলেন দু'ভাই, সদাশিব আর সত্যহরি। সদাশিব ছিলেন ভাল শিকারী। সুন্দরবন অঞ্চলে তিন বার তিনটে কেঁদো বাঘ তিনি মেরেছিলেন, চিতাবাঘ মেরেছিলেন অন্ততঃ দু'ডজন। গায়ে ছিল অসুরের মত শক্তি আর মনে ছিল দুর্ধর্ষ সাহস। দীর্ঘ দশাসই চেহারা, সহসা লোকে পাঞ্জাবী বলে ভুল করতো।

সত্যহরি কিন্তু দাদার মত ছিল না। অমন লম্বা চওড়া জোয়ান না হলেও খাটাখাটুনির ব্যাপারে সে পিছ্‌পাও হতো না। জমিদারী দেখাশুনার ব্যাপারে জলা-জংগল ভেঙে ঘোরাফেরা করতে কোন সময়েই তার বাধতো না, বর্ষা কি রোদ সে গ্রাহ্য করতো না। জমিদারীটা দেখাশুনা করতো সত্যহরি, আর সদাশিব থাকতো শিকার আর খেলাধূলা নিয়ে।

দু'ভাইয়ে মনের মিল ছিল খুব। সত্যহরি যা করতো তাই, সদাশিব কখনো কোন ব্যাপারে কৈফিয়ৎ চায়নি। কিন্তু হঠাৎ একদিন কি হলো কে জানে, সন্ধ্যার পর দু'ভায়ে দোতলার নাচ-ঘরে কথা বলছিল, হঠাৎ একটা বন্দুকের শব্দ শোনা গেল, তারপরেই সত্যহরি হন্তদন্ত করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বাড়ির লোকেরা ছুটে এলো, দেখলো গুলি খেয়ে সদাশিব মেঝের উপর পড়ে আছে। সেই থেকে সত্যহরির আর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। ব্যাপারটা পুলিশে গেলে অনেকদূর গড়াতো কিন্তু বড় বৌ চারদিক বিচার করে ব্যাপারটা সেইখানেই চাপা দিলেন। পুলিশের কানে যখন কথাটা পৌছালো, তার তিনদিন আগে সদাশিববাবুর অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হয়ে গেছে।

আইন-আদালত হলো না বটে কিন্তু শ্রাদ্ধের পর থেকেই দেখা দিল এই প্রেতাত্মা।

বাড়ীতে পুরুষ মানুষ কেউ ছিল না। সদাশিব ছিলেন নিঃসন্তান, আর সত্যহরির একটি মাত্র ছেলে, বয়স মাত্র দু'বছর। বড় বৌ নিজেই জমিদারী দেখাশুনা করতে লাগলেন। এই প্রেতাত্মার সদ্‌গতি করার জন্য তিনি অনেক কিছুই করলেন কিন্তু শেষ অবধি কিছুই হলো না। শেষে ওই দু'শো টাকা প্রণামীর কথাই রাষ্ট্র করতে হলো। কিন্তু তাতেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

রায়নগর থেকে ইচ্ছামতী প্রায় ক্রোশখানেক পথ। নদীর কোণেই শ্মশান। শ্মশানের পাশেই ডোমপাড়া। কালু ডোম ছিল ডোম-পাড়ার সর্দার। মদ আর মড়া ছিল তার সঙ্গী। হাঁড়িভরা তাড়ি আর মড়ার চুলী ছাড়া সে আর কিছু বুঝতো না। দু'শো টাকা পুরস্কারের কথাটা তার কানে পৌছালো, বললো—জীবনে তো ভূত দেখিনি, একবার দেখে আসি।

কালু রায় গিন্নীর সঙ্গে দেখা করলো, বললো—আজ রাতে আমি ওই ঘরে থাকবো।

বড় বৌ কালুকে চিনতেন, পূজা-পার্বনের দিন সে আসতো,

পার্বনী নিয়ে যেতো। বললেন—তুই কী করবি? তন্ত্রমন্ত্র কিছু জানিস?

কালু বললো—তন্ত্রমন্ত্র নয়, আমি বড়বাবুর সঙ্গে কথা বলবো। বাবার মুখে শুনেছি, অপঘাতে যাঁরা মারা যান তাঁরা অনেক সময় দেখা দেন, কিছু বলতে আসেন, তাঁদের সেই কথাটা শুনতে হয়। আমার তাই মনে হয় বড়বাবুও কিছু বলতে আসেন, তাঁর কথাটা বলা হয়ে গেলেই তিনি আর থাকবেন না। আমি তাই এক রাত্তির ওই ঘরে থেকে দেখতে চাই বড়বাবু কি বলতে চান।

—তুই একা থাকবি?

—একা নয় তো দোকা পাবো কোথায় মা, আমার অত ভয়-ডর নেই, শ্মশানেই তো পড়ে থাকি, আর এ-তো জমিদার বাড়ী। এখানে একটা ডাক পাড়লেই তো দশজন ছুটে আসবে।

বড়বৌয়ের কাছ থেকে দুটো টাকা চেয়ে নিয়ে কালু বিদায় হলো। সন্ধ্যাবেলা দু'বোতল ধেনো মদ গামছায় জড়িয়ে নিয়ে কালু এলো। দরোয়ান তাকে পৌঁছে দিল দোতলার নাচঘরে, বললো—রাতে যদি ভয়-ডর পাস্ তো সাড়া দিস্। আমরা ক'জন ওদিকের বারান্দায় শুয়ে থাকবো, ডাকলেই সাড়া পাবি।

কালু বললো—তোরা নাক ডাকিয়ে ঘুমুগে যা, তোদের আমি ডাকবো না, তোরা কি আমাকে সেই মানুষ পেয়েছিস? কত অমাবস্যার রাত ইচ্ছামতীর শ্মশানে কাটিয়ে দিলুম। হুঃ!

কালু দরজার পাশে মেঝের উপর বসে পড়লো।

দু'মহল বাড়ী। সদর মহলে মস্ত কাছারি বাড়ীর উপরের তলায় নাচঘর। সেখানে একদিন বড় বড় গাইয়ের আসর বসতো। কত নাচিয়ে নেচে গেছে। লম্বা টানা হলঘর, অন্ততঃ একশো লোক ফরাসের উপর বসে আসর জমাতে পারে। এখানে কতদিন কত জমিদারের দরবার হয়েছে। নিবারণ মুখুজ্যে যখন রেশারেশি করে ভাইয়ের ঘর জ্বালিয়ে দিলে তখন এই নাচঘরে কর্তাবাবুর দরবারে তার বিচার হয়েছিল। সে বিচার-সভায় কালুও এসেছিল তার বাবার

হাত ধরে। কালুর বয়স তখন কতই বা, সাত-আট বছর হবে। সেই প্রথম সে এই নাচঘরে এসেছিল আর আজ এসেছে এই দ্বিতীয় বার। সেদিনকার নাচঘরে কত লোক, কত বরকন্দাজ, কত জোলুষ, আজ সে একা। কালু ভাল করে নাচঘরটা একবার দেখে নেয়।

দরজার সামনে একটা টুলের উপর লণ্ঠনটা বসানো আছে। সে লণ্ঠনের আলোয় লম্বা ঘরখানার শেষ অবধি ভাল দেখা যায় না। পর পর মাথার উপর তিনটে ঝাড়লণ্ঠন। দেয়ালের গায়ে বড় বড় আয়না। সারি সারি দরজার মাথায় একখানি অয়েল-পেন্‌টিং করা ছবি। ওদিকের দেয়ালে কয়েক জোড়া ঢাল আর বল্লম সাজানো। চার কোণে ব্রাকেটের উপর চারটে বাঘের মাথা। ঘরের মাঝে একখানি গোল টেবিল আর খান চারেক চেয়ার। কালু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো, নাঃ, এ ঘরে ভয় পাবার মত তো কেথাও কিছু নেই। তবে এত বড় ঘরে একলা থাকলে একটু ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়, কিন্তু কালু এর চেয়ে ঢের বেশি ফাঁকা শ্মশানে রাত কাটায়। তবে সারাদিন-রাত দরজা বন্ধ করে রাখায় ঘরটা ভ্যাপষা হয়ে উঠেছে। বাতাস না থাকার জন্য কেমন যেন মাথা ধরে যায়। নদীর ধারে কিন্তু এইটি হবার জো নেই, যদি কোথাও না হাওয়া থাকে তবু নদীর ধারে হাওয়া আছেই।

কালু গামছার ভিতর থেকে বোতল দুটি বের করলো। তারপর উঠে গিয়ে বসলো একখানি চেয়ারে। টেবিলের উপর বোতল দুটি রেখে সে ভালো করে জাঁকিয়ে বসলো; আজ সে একটু বড়মানুষী করে নিক্। মাটিতে বসে মেঝেতে বসে সে অনেক তাড়ি খেয়েছে, আজ চেয়ারে বসে টেবিলে বোতল রেখে খাবে। একটা গেলাস থাকলে ভাল হয় কিন্তু গেলাস আর এখন পায় কোথা। একটা বোতলের ছিপি খুলে কালু আধ বোতল গলায় ঢেলে দিলে। তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে বসে বসে ভেবে নেবার চেষ্টা করলে নিজেকে ঠিক জমিদার বলে মনে হয় কি না। তারপর সহসা চেয়ার ছেড়ে সে উঠে পড়লো, বললো—দূর, এতে যে কেন বাবুরা বসেন

কে জানে, এতে বসার কোন সুখ আছে, হাত পা ছড়ানোর উপায় নেই।

বোতল নিয়ে কালু নেমে এলো মেঝের উপর। ভাল করে পা ছড়িয়ে বসে বোতলের বাকিটুকু গলায় ঢেলে দিলে। তারপর গামছায় মুখটা মুছে নিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে বললে—হ্যাঁ, এতক্ষণে বসে আয়েস হলো, মেজাজ ঠিক হলো।

একটা বড় শালপাতা জড়ানো চুরুট ধরিয়ে কালু টানতে সুরু করলো। নেশাটা বেশ জমে উঠলো। চুরুটটা শেষ করে কালু ঝিমুতে সুরু করলো। ভুতের ভয়ে সারারাত তো জেগে বসে থাকা যায় না, ভূত যখন আসবে তখন জাগলেই চলবে।

দেউড়িতে দারোয়ানের আর সাড়া নেই, সারা বাড়ী নিঝুম হয়ে গেল। কালুরও দিব্যি নাক ডাকতে সুরু করলো।

ঠিক কতক্ষণ বাদে কালুর ঘুম ভাঙলো আর কেন যে ঘুম ভাঙলো তা বলা শক্ত। চোখ মেলেই সবার আগে তার চোখে পড়লো মদের বোতল দুটো। ভর্তি বোতলটার ছিপি খুলে আগে সে খানিকটা গলায় ঢাললো তারপর সোজা হয়ে বসলো। আর ঠিক তখনই কয়েকবার দপ দপ করে উঠে লণ্ঠনটা নিভে গেল। চাকর তেল চুরি করেছে নাহলে এখন তো লণ্ঠনটা নিভে যাবার কথা নয়। অন্ততঃ সারা রাত আলোটা জ্বলা উচিত। যাক্ গে, একফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছে দরজা দিয়ে। তাতে ঘরের অন্ধকারটুকু কেমন যেন আবছায়া এলোমেলো হয়ে উঠেছে। সেই আবছায়া ঘরের মধ্যে কি যেন একটা নড়ছে। কালু ভাল করে দেখলো, কে একজন ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে। কালু বলে উঠলো—কে?

লোকটি এবার সামনে এসে দাঁড়ালো। কালু তো অবাক, এ যে চৌধুরীদের বড়বাবু, সেই হাতকাটা শার্ট আর ধুতি। সহসা কালুর মুখে কোন কথা জাগলো না।

—কি রে কালু, তুই এখানে কি করছিস্?

কালু সত্যি থতিয়ে গিয়েছিল, এবার যেন সে কথা খুঁজে পেল, ঢিপ করে একটা প্রণাম করে বললো—পেন্নাম হই বড়বাবু।

—থাক্ থাক্, তা তুই এখানে কি করছিস্?

—আজ্ঞে, আপনার প্রেতিক্ষে করছি। বড় মা বললেন, 'তুই এখানে থাক্, বড়বাবু যদি আসেন তো তাঁকে জিজ্ঞেস করে নিস তিনি কি চান।'

—বড় বৌ তোকে পাঠিয়েছে কেন, নিজে থাকতে পারেনি?

—আজ্ঞে, সে তো সত্যি কথাই, আপনার সামনে কি সবাই থাকতে পারে হুজুর, ভয় করে তো।

—ভয় করে, আমি তাকে খেয়ে ফেলবো? তোদের মাথাগুলো সব একসঙ্গে গুঁড়িয়ে ফেললে তবে আমার রাগ যায়, তোরা সব সমান পাজী!

—সে তো ঠিক কথা হুজুর, সব মানুষই পাজী, সেইজন্যই তো আমি লোকালয় ছেড়ে শ্মশানে গিয়ে থাকি।

—ঠিক করেছিস্, তুই ঠিক বুঝেছিস্। নাহলে যে ভাইকে আমি মানুষ করলুম সেই ভাই আমাকে গুলি করে মারলে! এখন আবার এই নায়েব ব্যাটা মতলব করেছে সমস্ত জমিদারীটা হাতিয়ে নেবে। বড় বৌ মেয়েছেলে—কিছু বোঝে না, বলবি নায়েব-গোমস্তা সব যেন বিদায় করে দেয়, আমার হুকুম।

—ঠিক বলবো হুজুর।

এবার ছায়ামূর্তি যেন কিছুটা খুশি হলো। সামনে থেকে সরে গেল, ওদিককার একখানি চেয়ারে গিয়ে বসলো। কালু চুপ করে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। শ্মশানে এতদিন তার কেটেছে কিন্তু প্রেতাত্মাকে এমনভাবে মুখোমুখি সে কখনও দেখেনি। ঘরের মধ্যে আর বসে থাকবে না এক দৌড়ে পালিয়ে যাবে, তাই সে ভাবতে লাগলো, কিন্তু উঠে পালানোর মত শক্তি সে পেল না। হঠাৎ একটা কথা তার মনে হলো, বললো—হুজুর, আর একটি কথা।

—কী?

—নায়েব গোমস্তাকে ছাড়িয়ে দিলে জমি-জায়গা দেখাশুনা করবে কে ?

—সব বেচে দেবে। শুধু এই রায়নগরটা রাখবে।

—অতো টাকা পয়সা নিয়ে রাখবে কোথায় হুজুর. মেয়েছেলে, চোর ডাকাতের ভয় আছে।

—রাখবার জন্যে ব্যাংক আছে। আর রাখবার কোন দরকারও নেই। একটা বড় হাইস্কুল করে দেবে এখানে। কাছারি বাড়ীতে ইস্কুল বসবে, আর ওই টাকার সুদে চলবে। বুঝলি ?

—বুঝেছি হুজুর।

—না কিচ্ছু বুঝিস্‌নি, শোন্—ইস্কুল হবে আমার নামে—সদাশিব হাইস্কুল। আর নাবেকে যেন কাল সকালেই বিদায় দেয়, কলিকাতা থেকে আমার বন্ধু হরেন মল্লিককে আসতে বলবে, সেই সব ব্যবস্থা করবে, বুঝলি ?

—বুঝেছি হুজুর, বড় মা'কে সব বলবে।

—কি নাম বললুম ?

—হরেন মল্লিক।

—হ্যাঁ, সব ঠিক ঠিক বলবি। বলবি বড়বাবুর হুকুম, অন্যথা না হয়।

—বলবো হুজুর !

ছায়া এবার চেয়ার থেকে উঠে পড়লো। আবার সুরু হলো ঘরের মধ্যে পায়চারি করা।

চাঁদের আলোর আবছায়াতে সাদা কাপড়ের ছায়াটি নড়ে, কালু যত দেখে ততই তার মনে হয় যে যেন স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু চোখ চেয়ে তো কেউ স্বপ্ন দেখে না। কালুর যেন এবার অল্প অল্প ভয় করতে থাকে।

হঠাৎ ছায়া আবার কালুর সামনে এসে দাঁড়ালো, বললো—আমাকে তোর ভয় করছে না ?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ, তা একটু একটু করছে বৈ কি।

—করতেই হবে, আমাকে বড় বড় কেঁদো বাঘ ভয় করতো আর তুই তো সেদিনকার ছেলে। কতগুলো বাঘ আমি মেরেছি তুই জানিস ?

—আজ্ঞে, শুনেছি বিশ-পঁচিশটা।

—ঠিক। অনেক বাঘকে আমি গুলি করে মেরেছি, শেষে এই বন্দুকের গুলিতে আমি নিজেও মরেছি। কি বলিস ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর।

—আচ্ছা, তুই কিছু শুনতে পাচ্ছিস ?

—কি হুজুর ?

—এই যে আমি কথা বলছি, আর খন খন করে একটা শব্দ হচ্ছে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর।

—ওটা কিসের শব্দ বল দিকি ?

—তা তো জানি না, হুজুর।

—সেই বন্দুকের গুলিটা বুকের মধ্যে বিঁধে আছে।

—তাই হবে, হুজুর।

—হবে নয়, তাই আছে।

—তাই আছে, হুজুর।

—ওই গুলিটা তোকে বের করে দিতে হবে।

—আমি কি করে বের করে দেব হুজুর, আমি তো ডাক্তার নয়।

—ডাক্তার লাগবে না, আমি যা বলছি শোন, এই ছাখ গুলিটা ডানদিকের পাঁজরের নিচে আটকে আছে, ছাখ—চকিতে সাদা জামার ছায়াটা সরে গেল, দেখা গেল মাথা থেকে কোমর অবধি একখানা কংকাল।

এবার কালুর মদের ঝোঁক কেটে গেল, তার মনে হলো সে যেন কাঁপছে।

কংকাল বললো—দেখছিস্ ? গুলিটা সামনের দিক দিয়ে বুকের মধ্যে ঢুকেছে, পিঠের দিক থেকে ঘা দিলে ওটা আবার সামনে দিকে

বেরিয়ে যাবে। আমি উপুড় হয়ে শুচ্ছি, তুই একটা হাতুড়ি দিয়ে পিঠে ঘা মার।

কালু এবার যেন পালাবার একটা ফিকির পেল, বললে—তাহলে একটা হাতুড়ি নিয়ে আসি।

—ওই তো হাতুড়ি। ওই কোণে রয়েছে—কংকাল নিজেই হাতুড়িটা নিয়ে এলো, বললো—এই যে হাতুড়ি, আমি শুচ্ছি, পেটা।

কংকাল সেইখানেই শুয়ে পড়লো। শুয়ে পড়লো একেবারে দরজার সামনে। কালুর পালানোর পথটুকু বন্ধ করে দিল যেন।

কালু আর কি করে, উঠে দাঁড়ালো, হাতুড়ি দিয়ে কংকালের পিঠে মারলো এক ঘা। ভয়ে ভয়েই মারলো, কিসে কি হয় বলা তো যায় না।

কংকাল তর্জন করে উঠলো—তোর গায়ে কি এতটুকু জোর নেই, হতভাগা? ভাত খাস না? হুম দাম পেটা। নাহলে আমি ওই হাতুড়ি তোর মাথায় মেরে শিখিয়ে দোব কি করে হাতুড়ি পেটাতে হয়। পেটা হতভাগা!

কালু হুম করে এক ঘা মারলো, তারপর বললো—আরো জোরে মারবো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, যত জোর তোর গায় আছে!

—আপনার লাগবে না তো?

—আমার কথা তোকে ভাবতে হবে না, পেটা।

কালু হুমদাম করে হাতুড়ি পেটাতে সুরু করে দিল।

হাতুড়ির ঘা সত্যি কারও গায়ে পড়ছে কিনা কালু তা বুঝতে পারে না। তবে এক এক ঘা মারে, শব্দটা কানে এসে বাজে, আর তারই সঙ্গে শুনতে পায় ফোঁস করে এক একটা নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ। শুধু নিঃশ্বাস ফেলার শব্দই নয়, এক এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্‌টা যেন এসে লাগে কালুর গায়। কালুর মনে হয় ঠাণ্ডা যেন চারিপাশ থেকে চেপে ধরছে। হাতুড়ি পেটানোর শ্রমে দেহটা যদি বা একটু চনচনে হয়ে ওঠে কিন্তু যত পেটায় ততই যেন শীতের কাঁপুনি

জাগে হাড়ের ভিতরে। কালুর এক সময় মনে হয় এবার বুঝি সে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে।

হঠাৎ কোন এক সময় ঠন্ করে একটা শব্দ হলো। একটা কি ছিট্‌কে এসে লাগলো কালুর কপালে। এবার সত্যি কালু চোখে অন্ধক.র দেখলো, মাথা ঘুরে পড়ে গেল সেইখানেই।

—কালু! কালু সর্দার!

একসঙ্গে ক'জন চাকর দরোয়ান এসে ঘরে ঢুকলো। কালুর কপাল কেটে রক্ত ঝরছে, মেঝের উপর হাতুড়িটা পড়ে আছে। দেখা গেল একখানি চেয়ারের খানিকটা কালু হাতুড়ি পিটিয়ে ভেঙেছে আর চেয়ারের পাশেই পড়ে আছে একটা শিসের গুলি—বন্দুকের গুলি।

সবাই বললো—কালুটা মাতাল, মদ খেয়ে মাতলামি করেছে।

আবার কেউ বললো—মাতলামি নয় রে, মাতলামি করে কেউ কখনো কপালে হাতুড়ি মারে? এ ভূতের সঙ্গে মারামারি হয়েছে। অতো সাহস কি ভাল।

তা সে ভালো মন্দ যাই হোক চোখেমুখে জল দিয়ে কালুর জ্ঞান যখন হলো, রাত তখন প্রায় তিনটে। কালু কিন্তু কাউকে কোন কথাই বললো না, বোতলের মদটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে বোতল দুটি গামছায় জড়িয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে নিচে নেমে এলো, তারপর শুয়ে পড়লো সদর দরজার সামনেই।

কে একজন বললো—কি হয়েছিল রে?

কালু বললো—কিছু না, যা, আমাকে এখন ঘুমুতে দে।

ঘুম থেকে উঠে কালু বড় বৌয়ের সঙ্গে দেখা করলো। বড় বৌ সব কিছু শুনলেন। বিশ্বাসও করলেন। সেইদিন থেকেই জমিদারীর নতুন বিলি ব্যবস্থা করার জন্য তৎপর হলেন। ছ'মাসের মধ্যে সদর কাছারিতে সদাশিব হাইস্কুলের পত্তন হয়ে গেল। নাচঘর থেকে প্রেতাত্মাও অন্তর্হিত হলো।

গুম্‌টি ঘরের লোকটি

পশ্চিমের ছোট্ট সহরটিতে গিয়েছিলাম কয়েকদিন বিশ্রাম নিতে। কলিকাতার নিরবচ্ছিন্ন কাজ আর সময়ানুবর্তিতা থেকে রেহাই পেতে চেয়েছিলাম কয়েক দিনের জন্য।

ছোট্ট সহর। মানুষের ভীড় নেই। যে ক'জন আছে, কারুর কোন ব্যবস্থা নেই, সকলেরই অখণ্ড অবসর। সর্বদাই বেশ একটা ঢিলে ভাব, সময়ের সঙ্গে সবাই যেন গা এলিয়ে দিয়েছে। অবসর উপভোগ করার এই যে একটা সহজ স্বাচ্ছন্দ্য, এইটুকুই ভাল লাগে। সারাটা দিন ঘুমিয়ে, না হয় বই পড়ে কাটে, বিকালের দিকে খানিকটা বেড়িয়ে আসি, রাতে খেয়ে-দেয়ে একখানি বই নিয়ে আবার শুয়ে পড়ি। কোন ভাবনা-চিন্তা নেই, দিন কেটে যায়।

কারুর সঙ্গে বিশেষ আলাপ করিনি। ইচ্ছা করেই করিনি। যখন তখন কেউ ঘরে আসে, কানের কাছে বকবক করে, এটা পছন্দ হয় না। একা থাকি, একলা পড়াশুনা করি একলা বেড়াই।

প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা এসে বসি রেললাইনের ধারে একটি টিলার উপর। টিলাটির পাশ দিয়েই রেললাইনটা ঘুরে গেছে, ওদিকে লাইনের পাশেই একটা গুম্‌টি ঘর। ওই গুম্‌টি ঘরে অনেকদিন আগে একজন পয়েন্টস্‌ম্যান থাকতো, এখন আর ওখানে কোন লোক নেই। পুরানো পয়েন্টস্‌ম্যান মারা যাবার পর কর্তারা ঠিক করেছেন ওখানে আর নতুন লোক দেবার দরকার নেই। গুম্‌টি ঘর খালি পড়ে আছে।

গুম্‌টি ঘরটির পিছনে শালবন। বনের শেষে মেঘের মত পাহাড়, সেই পাহাড়ের আড়ালে সূর্য অস্ত যায়। আকাশটা অনেকক্ষণ লাল হয়ে থাকে। তারপর কালোর আভা ধরে লাল রঙে। শেষে লালটুকু কালো হয়ে, সবই অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায়। তারপরেও কিছুক্ষণ বসে থাকি। অন্ধকার চারিপাশে কেমন যেন ছম্‌ছম্‌ করতে

থাকে। টিলার পিছনে কয়েকখানি কুঁড়েঘর। সেখানে আলো জ্বলে, মানুষের গলা শোনা যায়। গম্‌গম্‌ করে সাড়ে-ছ'টার মেল চলে যায়, তারপর আমি টিলা থেকে নেমে আসি। আমি বাড়ী পৌছাতে পৌছাতে আকাশে চাঁদ ওঠে।

শীতের দিন ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে। সাড়ে ছ'টার ট্রেন আসতে আসতে মনে হয় রাত বুঝি অনেক হয়ে গেল। সেদিন আকাশে মেঘ ছিল। সারাদিন সূর্য দেখা দেয়নি। সন্ধ্যার আগেই যেন অন্ধকারটা জমাট বেঁধেছে বলে মনে হচ্ছে। একলা বসে আছি। উঠি উঠি করেও প্রতিদিনেরই অভ্যাস মত ট্রেনখানি আসার অপেক্ষা করছি। ওদিকে নীল আলোর সিগ্‌ন্যাল দেখা দিয়েছে, এবার ট্রেনখানি আসছে।

হঠাৎ চোখে পড়লো সামনের গুম্‌টি ঘর থেকে একটি মানুষ বেরিয়ে এলো। লোকটি ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালো লাইনের ধারে। এবার দূরে ট্রেনের শব্দ পাওয়া গেল। ইঞ্জিনের আলো ফুটে উঠলো গাছগুলির মাথায়। জোরালো আলো এসে পড়লো লাইনের উপর। মানুষটি লাইনের পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। দেশোয়ালি লোক। গায়ে একটা খাঁকি রেলের সোয়েটার, পরনে আধ-ময়লা কাপড়। ট্রেনখানি সামনে আসতেই লোকটি লাফিয়ে পড়লো ইঞ্জিনের সামনে। চমকে উঠলাম, চকিতে দাঁড়িয়ে উঠলাম। ঝক্‌ঝক্‌ করে ইঞ্জিন চলে গেল। ঝটাং ঝটাং করে একখানির পর একখানি বগী পার হয়ে গেল। গাড়ী চলে গেল, আবার সেই অন্ধকার ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম লাইনের উপর,—কই, কাটা মানুষটি তো কোথাও নেই। টর্চের আলো ফেললাম, না লাইনতো পরিষ্কার। তাহলে? মানুষটি কি হাওয়ায় মিশে গেল নাকি?

ব্যাপারটার কোন কুলকিনারা পেলাম না, ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরলাম।

যাই হোক কথাটা কাউকে বললাম না, লোকে শেষে আমায় পাগল বলে ভাববে।

পরদিনও যথারীতি সেই টিলার উপরে গিয়ে বসলাম। আজ এমন একটা স্থানে গিয়ে বসলাম যাতে লাইনের সবটুকু এবং গুম্‌টি ঘরটা স্পষ্ট চোখের উপর থাকে। এখানে বসার যে সত্যই কোন যুক্তি ছিল তা নয়, তবু কেমন যেন মনে হয়েছিল, কালকের মত ঘটনা আজও আবার ঘটতে পারে। কেন যে মনে এই কথাটা উঠেছিল তা জানি না। তবু আজ একেবারে লাইনের উপরে গুম্‌টি ঘরের ঠিক সামনে গিয়ে বসলাম।

একা একা বসে আছি। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। আকাশের রঙিন আভা সূর্যাস্তের সমারোহে মিলিয়ে গেল শালবনের পিছনে; দিগন্তের পাহাড়ের কোল থেকে কালো ছায়া এগিয়ে এলো সন্ধ্যার আকাশকে ছেয়ে দিতে। অন্যদিনের মত কিন্তু আজ এই সান্ধ্য নির্জনতা একান্ত মনে উপভোগ করতে পারছিলাম না। আজ মন পড়েছিল সামনের গুম্‌টি ঘরটির উপর। অন্ধকারে গুম্‌টি ঘরখানির পানে তাকিয়ে ছিলাম এক দৃষ্টে। যেন অলক্ষিতে কোন ফাঁকে দৃষ্টিকে কিছু ফাঁকি দিয়ে ঘটে যেতে না পারে।

আকাশে চাঁদ উঠলো। পুর্ণিমা বোধ হয় কাছাকাছি। চাঁদ প্রায় পূর্ণচন্দ্রের মতই। এই চন্দ্রালোকে সবকিছুই স্পষ্ট দেখা যাবে। মনে উৎসাহ পেলাম। ওদিকে সিগ্‌ন্যালের মাথায় নীল আলো দেখা দিল। ইঞ্জিনেরও শব্দ শোনা গেল দূরে। সজাগ হয়ে উঠলাম।

সামান্য সময়ের মধ্যে ট্রেনের আলো দেখা দিল, আগুনের ফুলকি উড়তে দেখা গেল গাছের মাথায়। গাড়ী এসে পড়লো। পরক্ষেণেই দেখি কালকের সেই লোকটি গুম্‌টি ঘর থেকে বেরিয়েছে। ইঞ্জিনের ফ্লাস্ লাইটের সামনে লোকটি স্পষ্ট হয়ে উঠলো। গায়ে খাঁকি সোয়েটার, পরণে ধুতি। মানুষটি একবার মুখ তুলে তাকালো ইঞ্জিনের পানে। তারপর ট্রেনখানি কাছে আসতেই ঝাঁপিয়ে পড়লো লাইনের উপর। ঝক্‌ঝক্ ঝক্‌ঝক্ করে গাড়ী চলে গেল। পরক্ষণেই মনে হলো মানুষটি যেন কাটা পড়ে আছে লাইনের উপরে, মুণ্ডটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে দেহ থেকে।

কিন্তু সে যেন এক নিমেষ। পরক্ষণেই দেখি কোথাও কিছু নেই। মনে আর কোন সন্দেহ রইল না যে ব্যাপারটা ভৌতিক। গুম্‌টি ঘরের কোন লোক চলন্ত ট্রেনের সামনে পড়ে আত্মহত্যা করেছিল এ তারই প্রেতাত্মা, জীবনের সেই শেষ অধ্যায়ের অভিনয় করে চলেছে বারবার।

আমার ধারণা যে সত্য তাই জানতে পারলাম একদিন ওখানকার এক ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে। গুম্‌টি ঘরটি খালি পড়ে আছে, এই কথা তুলতেই তিনি বললেন—ওখানে যে পয়েন্টস্‌ম্যান থাকতো সে একদিন ট্রেনের সামনে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করলো, তারপর থেকেই ওখানে তার ছায়া দেখা যায়। তারপরে যে ডিউটিতে ছিল সে এই সব ব্যাপার দেখে চাকরী ছেড়ে দিল। শেষ অবধি স্টেশনমাস্টার ওই গুম্‌টির পয়েন্টস্‌ম্যান পদটাই তুলে দিলেন। ওদিকে সন্ধ্যার পর অনেকে মানুষের ছায়া দেখেছে। ওটা ভূতুড়ে গুম্‌টি। রাতে এখানকার কোন লোক ওর আশে পাশে যায় না।

ব্যাপারটা সেইখানেই মিটে গেল। আমিও গুম্‌টি ঘরের দিকে বেড়াতে যাওয়া ছেড়ে দিলাম।

ব্যাপারটা কিন্তু সত্যই সেখানে মিটলো না। পনেরোটা দিন দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল। কলিকাতায় ফেরার দিন এসে পড়লো। টিকিট বুক করতে গেলাম, স্টেশন মাস্টার বললেন—আমিও যাচ্ছি কলিকাতায়; ঘুমোবার আসন যদি পাওয়া যায় তাই দু'খানা বুক করবো, দু'জনে পাশাপাশি ঘুমুতে ঘুমুতে চলে যাওয়া যাবে।

ভাল কথা। তাঁর কথায় রাজী হয়ে এলাম।

রাত ন'টায় ট্রেন, প্রস্তুত হয়ে স্টেশনে চলে এলাম আধঘণ্টা আগেই। গাড়ী এসে পড়লো। কিন্তু ইঞ্জিনের পানে তাকিয়েই চম্‌কে উঠলাম। ইঞ্জিনের পিছনেই যে কয়লার গাড়ীখানি রয়েছে, সেই কয়লার স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আছে সোয়েটার ও কাপড় পরণে গুম্‌টি ঘরের সেই পয়েন্টস্‌ম্যান, আমার মুখের পানে তাকিয়ে

আছে, যেমনভাবে সে তাকিয়েছিল গুম্‌টিঘরের সামনে। প্ল্যাটফর্মের আলোয় চকিতে মনে হলো তার গলার উপর যেন একটা রক্তের লাল রেখা। চুপ করে স্থবিরের মত দাঁড়িয়েছিলাম। স্টেশন মাস্টার ডাকলো—আসুন।

বললাম—না, এ গাড়ীতে আমি যাব না।

—কেন, কি হলো? সীট রিজার্ভ হয়ে গেছে।

—হোক, এর পরের গাড়ীতে যাব।

—সে গাড়ী তো রাত তিনটেয়।

—তা হোক তবু এই গাড়ীতে আমার যাওয়া হবে না। আপনিও যাবেন না এই গাড়ীতে।

—কেন, কি হলো বলুন তো?

—ওই গুম্‌টি ঘরের পয়েণ্টস্‌ম্যানের ছায়া দেখলাম আমি ইঞ্জিনের উপর।

—ভূত? হাহাহা, মাস্টার মশাই হাসলেন—তাহলে আপনি থাকুন বসে এখানে, আমি একাই যাই।

মাস্টার মশাই 'নিদ্রাঘর'-এ উঠে পড়লেন, আমি প্ল্যাটফর্মেই বসে রইলাম। ট্রেন ছেড়ে দিল। নিজের ব্যবহারে নিজেই লজ্জিত হলাম। এই বয়সে ভূতের ভয়, নেহাৎ ছেলেমানুষের মত ব্যাপারটা হয়ে গেল। কোন রকমে মাথা নত করে ওয়েটিংরুমে এসে ঢুকলাম। দারোয়ানকে বললাম—এখন ঘুমোই, রাত তিনটের গাড়ী আসার আগে ডেকে দিস্।

সাংবাদিকের কাজ করি, নামকরা দৈনিক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত আছি। শিক্ষিত মহলে কিছুটা খাতির আমার অবশ্য প্রাপ্য। আমি এই ট্রেনে যাইনি শুনে সহকারী মাস্টারবাবু ছুটে এলেন, বললেন—কি, আপনি গেলেন না যে?

কি বলি, কি বলা উচিত একবার ভাবলাম, তারপর সত্যি কথাটাই বলে ফেললাম—গুমটির পয়েণ্টস্‌ম্যানের ছায়া দেখলাম ইঞ্জিনের পিছনে কয়লার গাদার উপর দাঁড়িয়ে আছে, তাই যেতে সাহস হলো না।

—কে গিরিধারী লাল? তাকে আপনি চিনলেন কি করে?

বললাম সব কথা।

সহকারী বললেন—মাস্টারবাবু ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেননি। শূলবেদনায় মাঝে মাঝে মানুষটা বড় কষ্ট পেতো। ছুটি চেয়েছিল, কলিকাতায় গিয়ে বড় ডাক্তারকে দেখাবে বলে তা মাস্টারবাবু ছুটি দিলেন না। শেষে রোগের যাতনায় বেচারা একদিন ট্রেনের সামনে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করলো। এখনও এক বছর হয়নি। লোকে বলে গুম্‌টিতে নাকি তার ভূত দেখা যায়। আপনিও যা বলছেন, তাতে তো অবিশ্বাস করার কিছু নেই।

—সেজন্যই কেমন যেন মনে হলো মাস্টারবাবুকে আমি ওই ট্রেনে যেতে বারণ করলাম।

সহকারী হাসলেন—উনি কোন দিন কারো কথা শোনেন না, নিজে যা করবেন তাই ঠিক।

সহকারী চলে গেলেন। একখানি বড় বেঞ্চের উপর হোল্ডলটা বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম।

ঘণ্টা দুয়েক পরেই হৈ-হুল্লোড়ে ঘুম ভেঙে গেল। ব্যাপার কি? ট্রেন এসে গেল নাকি? হাত-ঘড়িটার উপর টর্চের আলো ফেললাম, রাত তো সবে মাত্র বারোটা। এখন এতো হৈ চৈ পড়ার তো কোন কারণ নেই। তাড়াতাড়ি ওয়েটিংরুমের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। প্ল্যাটফর্মে লোকজন নেই, কিন্তু রেলের কর্মচারী ও কুলীরা ছুটোছুটি করছে। কোন এক সময় দারোয়ানটিকে দেখতে পেয়ে কাছে ডাকলাম, বললাম—কি হয়েছে রে?

—বড়া একসিডেণ্ট হুয়া, ইঞ্জিন গির গিয়া, বিশ মাইল আগে··· আপ্‌ ওই গাড্ডীমে নেহি গিয়া বহুৎ আচ্ছা কিয়া, নেহি তো আপ খতম্‌ হো যাতে।

স্টেশন মাস্টারের ঘরে গেলাম। সহকারী মাস্টারবাবু আমায় দেখেই বলে উঠলেন—গুড লাক—ভেরি গুড লাক্‌, অল্পের জন্য বেঁচে

গেলেন মশাই। নাহলে আপনি এতক্ষণ মাঠের মাঝে পড়ে গোঁঙাতেন।

কুড়ি মাইল আগে একটি ছোট পুলের উপর একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। ইঞ্জিন ও সামনের কয়েকখানি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। ক'জন হতাহত হয়েছে কিছুই জানা নেই। রিলিফ ট্রেন আসছে।

বললাম—মাস্টার মশাই তো গোড়ার দিকের গাড়ীতেই ছিলেন, তাঁর কি হলো, কিছু তো বুঝতে পারছি না।

—এখন কিছুই জানা যাবে না, কাল যখন রিলিফ ট্রেন ফিরবে তখন খবর পাব।

অবশ্য পরদিন রিলিফ ট্রেন ফেরা অবধি আমি অপেক্ষা করতে পারিনি। রাত তিনটের গাড়ীতেই আমি কলিকাতায় ফিরলাম। যেখানে একসিডেণ্ট হয়েছে তার পাশ দিয়েই আমাদের গাড়ী এলো। এম্বুলেন্স কম্পার্টমেণ্ট ছিল আমাদের ট্রেনে, আমাদের গাড়ী দাঁড়ালো সেখানে কিছুক্ষণ। ভাল গাড়ীগুলোকে পূর্ববর্তী স্টেশনে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ইঞ্জিন ও খান তিনেক বগী উল্টে পড়েছে লাইনের পাশে নিচু জমিতে, সেখানে ফ্ল্যাস লাইট জ্বেলে কাজ চলছে। কাছাকাছি গ্রাম থেকে কিছু লোক এসে পড়েছে, তারাও সাহায্য করছে।

জিজ্ঞাসা করলাম স্টেশন মাস্টার মশাইয়ের কথা। রেলকর্মচারীরা আমাকে প্রশ্ন করলো—তিনি ইউনিফর্ম পরে ছিলেন, না সাদা পোষাকে?

—সাদা পোষাকে।

—তাহলে বলা শক্ত। তবে শ্লিপিং কম্পার্টমেণ্টও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আপনি বরং এম্বুলেন্স-কারে গিয়ে দেখুন।

এম্বুলেন্স-কারে গিয়ে আমি আহতদের দেখলাম, কিন্তু মাস্টার মশাইকে তাদের মধ্যে পেলাম না। মনটা খুশি হলো, তাহলে তিনি আহত হননি।

পরদিন সন্ধ্যায় হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে খবরের কাগজ খুলে দেখি নিহতদের তালিকার মধ্যে মাস্টার মশাইয়ের নাম প্রথমেই আছে।

পরে খবর পেয়েছিলাম লাইন থেকে কিছুদূরে মাস্টার মশাই ছিটকে পড়েছিলেন, তাইতেই নাকি তাঁর মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায় পরদিন সকালে।

খবরটি পড়ে শুধু একটি কথাই আমার মনে জেগেছিল, স্লিপিং-কার তো চারিদিক বন্ধ করা থাকে, তা থেকে তো কারও ছিটকে যাবার কথা নয়। সে গাড়ী থেকে আর কেউ তো ছিটকে পড়েনি। মাস্টার মশাই একাই বা দূরে ছিটকে পড়লেন কি করে? এর মধ্যে সেই গিরিধারীলালের প্রেতাত্মার কোন হাত আছে কিনা কে জানে!

এক রাত্রি

নৌকা করে যাচ্ছিলাম। সন্ধ্যার পর হঠাৎ তুমুল জলঝড়ে নৌকা ডুবে গেল। নৌকা ডুবলো বললে বাড়িয়ে বলা হয়। নৌকা উল্টে গেল। ছোট নদী, কিনারার কাছেই নৌকা ওল্টালো, অল্প আয়াসেই তীরে এসে উঠলাম। ছোট নদী বলেই রক্ষা, চওড়া প্রশস্ত নদী হলে হয়তো তলিয়ে যেতাম।

নৌকাখানা সোজা করে জল ছেঁচে ফেলে আবার যাবার জন্য তৈরী হতে প্রায় দু'ঘণ্টা দেরী হলো, বৃষ্টি থেমে তখন কালবৈশাখীর আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। যথাস্থানে যখন পৌঁছলাম রাত তখন দশটা বেজে গেছে। সেখানে পৌঁছানোর কথা ছিল রাত আটটার আগে। কিন্তু আমি সেখানে পৌঁছলাম রাত তখন দশটা।

পাড়া গাঁ। সেখান থেকে মাইল দুয়েক হেঁটে গেলে তবে আমার গন্তব্য স্থানে পৌঁছানো যায়। পাকা পথ কিছু নেই। ধান জমির আলের উপর দিয়ে হাঁটতে হবে। সে রাতে হাঁটতে সাহস হলো না। ইতিমধ্যে আকাশে আবার মেঘ জমেছে। একটি খাবারের দোকান ঝাঁপ বন্ধ করছিল, সেখানে কিছু খেয়ে নিয়ে বললাম—আজকের রাতটা এখানে থাকতে দেবেন?

দোকানী বললো—না মশাই, বাইরের লোককে এখানে আমরা থাকতে দিই না। পর পর এ অঞ্চলে স্বদেশী ছেলেরা কয়েকটি ডাকাতি করে গেছে। সেই থেকে পুলিশের কড়া হুকুম আছে, বাইরের কোন লোককে যেন এখানে কোথাও থাকতে দেওয়া না হয়। আপনি বরং থানায় যান।

থানা গিয়ে আস্তানা নিতে ইচ্ছা হলো না। বললাম—বেশ, এমন কোন জায়গা আছে বলতে পারেন সেখানে শুয়ে রাতটা কেটে যাবে, ভিজতে হবে না।

—ওই পাশেই নদীর ঘাটে একটা চাতাল আছে, দেখুন।

সেই দিকেই গেলাম। নদীর তীর ধরে একটু গেলেই একটা ঘাট। ঘাটটি বাঁধানো। মাথার উপর ছাদ আছে, দু'পাশে উঁচু রোয়াক। একপাশে প্রচুর খড় জমানো। বোধ হয় কোন নৌকা খালাস করেছে। সেইখানে একটা রোয়াকের উপর শুয়ে পড়লাম। সঙ্গে তো কিছুই নেই। চুরি-ডাকাতির কোন ভয় ছিল না।

নতুন জায়গা। ঘুম আসতে চায় না। খানিকক্ষণ এপাশ ওপাশ করলাম। আবার ঝির ঝির করে বৃষ্টি নামলো। ব্যাং ডাকতে সুরু করলো। কিছুক্ষণ চুপ করে বৃষ্টির গান শুনলাম। তারপর কোন এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ কোন একসময় কে যেন আমার নাম ধরে ডাকলো। ঘুম ভেঙে গেল। আকাশে চাঁদ উঠেছে। আলো এসে পড়েছে আমার মুখের উপর। কে ডাকলো, চারিপাশে তাকিয়ে দেখলাম, কেউ তো নেই। আবার চোখ মুদলাম।

ঘুমিয়েছি। আবার কে যেন আমার নাম ধরে ডাকলো। ঘুম ভেঙে গেল, চোখ চাইলাম। চাঁদের আলো তখন খড়ের উপর এসে পড়েছে। সহসা মনে হলো খড়ের পাশে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। একটি মেয়েছেলে। কুয়াশার মত অস্পষ্ট। কেমন যেন মনে হলো, জিজ্ঞাসা করলাম—কে তুমি ?

অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারিত হলো—আমি গো, আমি !

—কে তুমি ?

—আমায় চিনতে পারছ না ? আমি তোমার স্ত্রী।

—আমার স্ত্রী ? আমি বিয়ে করলাম কবে ? আমার বয়স তো মাত্র বাইশ বছর।

সে কথার সে কোন জবাব দিল না, বললো—এসো। আমি যে তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি।

—আমার জন্য অপেক্ষা করছ ?—আমার সারা দেহ হিম হয়ে গেল। এ তো নিশ্চয়ই প্রেতাত্মা। রাতের এই প্রেত আমার জন্য এই নদীর তীরে অপেক্ষা করছে ? আমাকে ডাকছে।

—এসো!

—না। আমি তোমাকে চিনি না।

—ভয় করছে, না?—খিল খিল করে ছায়া হেসে উঠলো।

ধীরে ধীরে ছায়াটি এগিয়ে এলো আমার কাছে। সাদা কাপড় পরা অস্ফুট জ্যোৎস্নার মতই আবছা দেহ। শুধু চোখ দু'খানা দেখা যাচ্ছে। দুটো চোখ, স্পষ্ট, স্থির দৃষ্টি আমার মুখের উপর। মনে হলো উঠে দাঁড়াই। কিন্তু পারলাম না। সেই চোখের সামনে সারা দেহের শক্তি কেমন যেন লোপ পেয়ে গেল। সে কি করে তারই প্রতীক্ষায় যেন স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

ছায়া আমার সামনে এসে আমার মুখের পানে তাকিয়ে দাঁড়ালো। বললো—এসো, আমার সঙ্গে চলো।

—তোমার সঙ্গে কোথায় যাব?

—চলো না, খানিক ঘুরে আসি। অনেক দিন পরে তোমাকে পেলাম। কতদিন তোমার জন্য এখানে অপেক্ষা করে আছি। জানি তুমি আসবে। এসো—

সে আমার একখানি হাত ধরলো। আশ্চর্য ঠাণ্ডা হাত। মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা হিমের প্রবাহ বয়ে গেল। আর চুপ করে থাকতে পারলাম না, ধড়মড় করে উঠে বসলাম। হাতখানি ঝট্‌কা মেরে ছাড়িয়ে নিতে গেলাম, কিন্তু পারলাম না। তার মুখের পানে তাকিয়ে দেখলাম, তেমনি স্থির দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে। আমি যে হাতখানা ছাড়িয়ে নিতে চাই সেটা সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতে চায় না। হাত ধরে সে আকর্ষণ করলো, বললো —এসো!

সে আকর্ষণ এড়িয়ে যাবার শক্তি আমার ছিল না। ইচ্ছা হলো এক ঝট্‌কায় হাত ছাড়িয়ে নিই, কিন্তু পারলাম না। স্বচ্ছন্দে সে আমাকে টেনে নামিয়ে বসালো। আমি বুঝলাম, আমায় ভূতে ধরেছে, কিন্তু করি কি, একান্ত অসহায় হয়ে কাঁপতে লাগলাম! তার ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ আমার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে দিলে।

সে খিল খিল করে হেসে উঠলো। দেখতে দেখতে সে আমাকে বাগানের বাইরে টেনে আনলো। ধীরে ধীরে সে উঁচু হয়ে উঠলো, —প্রকাণ্ড, বিরাট। মাথা না তুলে তার মুখ দেখার আর উপায় রইল না। খিল খিল করে সে হেসে উঠলো—ভয় করছে, না?

ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

সহসা সে আমাকে তুলে ফেললো শূন্যে। উপরে—উপরে—আরো উপরে সে আমাকে তুলে নিলে। একটি গাছের মাথায় নিয়ে গিয়ে সে আমাকে বসিয়ে দিলে, বললে—বসো!

কোন রকমে বসলাম—একি, এখানে বসে আমি কি করবো?

—আমি এখানে থাকি, তুমিও থাকবে।

—মানুষ কখনো গাছে থাকে, তুমি আমাকে মাটিতে নামিয়ে দাও।

—তুমি আমার স্বামী, আমি তোমাকে ছাড়বো কেন? আমি যেখানে থাকি, তুমিও সেখানে থাকবে।

—আমি বিয়েই করিনি, আর আমি তোমার স্বামী হলাম কেমন করে?

—মিছে কথা। আমাকে স্ত্রী বলে মানতে এখন তোমার ভয় হচ্ছে। আমি কিন্তু ঠিক চিনেছি। বাবা পণের টাকা দিতে পারেননি, সেজন্য তুমিই তো আমাকে পুকুরের জলে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলে।

—আমি তোমাকে জলে ডুবিয়ে মেরেছি?

—হ্যাঁ গো, হ্যাঁ।

—আমি থাকি কলিকাতায়, সেখানে পুকুর কোথায়?

—মিছে কথা। তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না।

বাতাসের ঝাপটায় গাছ দুলে ওঠে, মনে হয় পড়ে যাব। প্রাণপণে কয়েকটি ডাল দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে থাকি। কোথায় যেন একটা পেঁচা হুট্ হুট্ করে ডেকে ওঠে। কি করবো ভেবে পাই না। সামনের পানে তাকিয়ে দেখি সেই দুটি চোখ।

কতক্ষণ এভাবে গাছের মাথায় বসেছিলাম কে জানে। কোন এক সময় সে বলে উঠলো—খুব ভয় করছে, না? আচ্ছা চলো তোমাকে নামিয়ে নিয়ে যাই।

নিমেষে সে আমার হাত ধরে নীচে নামিয়ে নিয়ে এলো।

এবরে নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

এতক্ষণে খানিকটা সাহস হলো, বললাম—আমাকে নিয়ে এমন করছ কেন? কি চাও বলত? আমি সত্যি বলছি, আমি তোমার স্বামী নই।

—বলছি তো আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না।

—আমি ঠাকুরের নামে দিব্যি করছি।

—ঠাকুর ঠাকুর করো না, এসো—ছায়া এবার ধমক দিয়ে উঠলো।

—ঠাকুর দেবতার নাম করবো না?

—না! এসো!

আমার হাত ধরে শাঁ করে সে একপাক ঘুরে গেল। মনে হলো আমার চারিপাশ দিয়ে যেন একটা ঝড় বয়ে গেল। পরক্ষণেই দেখি আমি একেবারে নদীর ঘাটে এসে দাঁড়িয়েছি। শ্মশান নাকি? চিতার মতই কি যেন একটা ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বলছে। সেই ধোঁয়া যেন সারা নদীর ঘাট ধরে নামছে। দুটো শেয়াল খ্যাঁক খ্যাঁক করছে। সে দেখি আবার ছোট্ট মানুষটি হয়ে গেছে আমার পাশে। অস্পষ্ট শাদা কাপড়, আর দুটো চোখ। স্থির, স্পষ্ট।

বললাম—এ তো শ্মশান!

—হ্যাঁ।

—এখানে আমাকে আনলে কেন?

—তোমাকে দেখাতে।

—কী?

—ওই যে আমি পুড়ছি। সবই জ্বলে গেল। সারা দেহ জ্বলছে। তোমার জন্য আমি জ্বলে পুড়ে মরলুম। উঃ!

—কোথায় তুমি জ্বলছ ? এই তো তুমি আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছ।

—না। আমি জ্বলছি। তোমাকেও আমি এমনি জ্বালাবো। হঠাৎ সে আমার হাত ধরে এক ঝট্‌কায় টেনে নিয়ে ফেলে দিলে একবারে চিতার উপর। আগুনের স্পর্শ পেয়েই সারা দেহ ছম ছম করে উঠলো। খিল খিল করে একটা হাসির আওয়াজ ভেসে এলো কানে। মনে হলো চারিপাশে অনেকগুলো ছায়া যেন নাচছে। আত্মরক্ষার একটা প্রচণ্ড আগ্রহ জাগলো। চিতাটা ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বলছিল বলেই রক্ষা। নইলে দগ্ধ হয়ে যেতাম। ঝট্‌ করে একটা জ্বলন্ত কাঠ টেনে নিয়ে চীৎকার করে উঠলাম—তবে রে!

ছায়াটা সট্‌ করে সেখান থেকে সরে গেল।

জ্বলন্ত কাঠখানা হাতে নিয়ে দৌড়লাম।

কতদূর ছুটলাম, কোনদিকে ছুটলাম, কিছুই জানিনে, পিছনে সারাক্ষণ কে যেন বলতে লাগলো—যেও না, যেও না, শোনো—

পিছন পানে না তাকিয়ে আমি দৌড়লাম।

হঠাৎ দেখি কতকগুলো বাড়ীর মাঝে এসে পড়েছি। একখানি বাড়ীর চাতালে তক্তোপোষের ওপর বসে দুটি লোক গাঁজা খাচ্ছে। কল্‌কের আগুনটা ধ্বক ধ্বক করে জ্বলছে। কাঠখানা ফেলে দিয়ে তাদের সামনে গিয়ে ঝুপ করে বসে পড়লাম।

তারা চমকে উঠলো, বললে—কে গো ? কি হলো ?

—পেত্নী! শ্মশানে টেনে নিয়ে গিয়েছিল!

মুখে আর কথা জোগালো না, তখন গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। হাঁপাতে লাগলাম। আমার অবস্থা দেখে ওদের একজন বললো—জল খাবে ?

—জল, দাও দাও!

হাতের কাছেই ঘটি ছিল, এগিয়ে দিল।

বেশ খানিকটা জল খেয়ে তবে একটু সুস্থ বোধ করলাম।

এবার তারা জিজ্ঞাসা করলো —কি হয়েছিল কি ?

বললাম সব কথা। শুনে বললে—ও তো হতেই পারে। ওটা যে শ্মশানের ঘাট। শ্মশানে ভূত প্রেত থাকবে এ আর আশ্চর্য কি ! কত রকমের কত মড়া আসছে ? রাতে ওখানে তো কেউ থাকে না। তারপর তুমি আবার একা ছিলে। যাক, নারায়ণ তোমাকে রক্ষা করেছেন। তোমার বাপ-মায়ের আশীর্বাদ। না হলে এই তো দু'বছর আগে এই শ্মশানের পাশ দিয়ে আসার সময় আমাদের হারাধন ডাক্তারকে কে ঘাড় মটকে মেরে ফেললো, খুব হাতযশ ছিল ডাক্তার-বাবুর, এক ফোঁটাতেই কত রোগ সারিয়েছে। ও শ্মশানটা বাবু জায়গা ভালো নয়।

আরেকজন কল্কেটা মুখ থেকে নামিয়ে বললো—থাক, রাতের বেলা ওসব কথা থাক্. বাম রাম, রাম রাম !

দশ পাউণ্ডের নোটখানি হাতে নিয়ে লোকটি চলে গেল।

ডাক্তার কাগজের প্যাকেটটি হাতের ব্যাগের মধ্যে ভরে নিয়ে একখানি ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়লো।

হোটেলে এসে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে ডাক্তার গুপ্ত ব্যাগটি খুললো, কাগজের প্যাকেটটি বের করলো। প্যাকেটটি খুলতেই বেরুলো একখানি হাত। মমির হাত, কনুয়ের কাছ থেকে কাটা। শীর্ণ সংকুচিত কালো একখানি হাত, আঙ্গুলের নখগুলি অবাধ কেমন যেন কুঞ্চিত। ডাক্তার ভালো করে নেড়ে-চেড়ে দেখলো, মনে হয় বুঝি এটা মাংসের নয়, একখানা কাঠের তৈরী। মনটা প্রসন্ন হলো, এই মমি সংগ্রহ করার ইচ্ছাতেই সে মিশরে এসেছে, না হলে ইউরোপ থেকে সে সোজা বাড়ী ফিরতো। দু'বছর প্রবাস জীবনের পর বাড়ী ফেরার আকর্ষণ পিরামিড দেখার চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু তার চেয়েও বেশী ছিল এই মমি সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা, সে আকাঙ্ক্ষা আজ পূর্ণ হলো।

ডাক্তার মমিটি কাগজে জড়িয়ে স্যুটকেসের এক পাশে রেখে দিলেন। কলিকাতায় ফিরে গিয়ে এই সম্পর্কে গবেষণা করার ইচ্ছা আছে। কাল সন্ধ্যার জাহাজেই তিনি রওনা হয়ে যাবেন। এখানে অনর্থক দেরী করার আর কোন হেতু নেই।

রাত তখন প্রায় বারোটা হবে। ডাক্তারের চোখে তখন সবে একটু তন্দ্রা এসেছে, এমন সময় ঘুম ভেঙ্গে গেল। মনে হলো, মরুভূমির গরম বুঝি এক ঝলক উত্তাপ নতুন করে পাঠিয়ে দিলে এই ঘরখানির মধ্যে। জানালা খোলা, পাখা চলছে, তবু গরম বুঝি আর কমতে চায় না। সমুদ্রতীরে এতটা গরম আশা করা যায় না।

হঠাৎ ডাক্তারের মনে হলো কার যেন নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। কে যেন ঘুঁরে বেড়াচ্ছে তার খাটের চারিপাশে। ডাক্তার

ভালো করে চারিপাশে তাকায়। অন্ধকারে যেটুকু দেখা যায়, কাউকেই দেখা যায় না। তাহলে মনের ভুল। জানালা দিয়ে বাইরের পানে তাকালো। বাড়ীর ছাদে ছাদে আলোর বিজ্ঞাপন। লাল নীল আলোর পানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আবার ডাক্তার চোখ বোঁজে।

চোখ বুঁজতে না বুঁজতেই ছ্যাঁৎ করে ঘুম ভেঙ্গে যায়। আবার মনে হলো কার যেন নিঃশ্বাস পড়ছে। একটা কালো ছায়া যেন তার খাটের পাশ থেকে সরে গেল। ডাক্তার বিস্মিত হলো। এমন তো তার জীবনে কখনো হয়নি। মমিটি সংগ্রহ করে আনার সঙ্গে অবচেতন মনের বদ্ধমূল সংস্কারে ধাক্কা লেগেছে বুঝি ? ভূতের ভয়ে ছম ছম করে উঠছে। ডাক্তার মনকে জোরালো করার জন্য বারান্দায় বেরিয়ে এলো। খানিকক্ষণ বারান্দায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আবার গিয়ে শুয়ে পড়লো।

পরদিন সন্ধ্যাতেই জাহাজ।

জাহাজে একখানি কেবিনে তু'জন যাত্রী। রাত্রে ঘুমোনোর কোন রকম অসুবিধা হয়নি। কাইরোর হোটেলের কথাটা ডাক্তার প্রায় ভুলেই গেল।

কিন্তু জাহাজে যা ঘটেনি ট্রেনে তাই ঘটলো।

বোম্বাই থেকে ট্রেনে কলিকাতা, তুটি দিন ও তুটি রাত। ডাক্তার আসছিল সেকেণ্ড ক্লাস কামরায়। একখানি বার্থে দেহটা এলিয়ে দিয়ে আধ-শোয়া অবস্থায় বসে বসে ডাক্তার চুরুট টানছিল।

অনেক আগে সন্ধ্যে হয়ে গেছে। চারিপাশ অন্ধকার শান্ত। কামরায় আর কোন লোক ওঠেনি। ছোট তুটি বার্থের কামরা। সামনের বার্থটি খালি। এবার কেমন করে নতুন করে পেশা জমাবে ডাক্তার তাই ভাবছিল। তু'টাকা ফীয়ের ডাক্তার এবার একেবারে ষোলো টাকা ফী করবে—কন্সালটিং ফিজিসিয়ন। একটা হাস-পাতালের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারলে ভাল হয়। পেশাটা জমবে ভালো।

ডাক্তার ভাবছে। চুরুটের ধোঁয়া উড়ছে। ধোঁয়াটা ধীরে ধীরে যেন জমছে আলোটার চারিপাশে। মেঘের মত আলোটাকে কে যেন চাপা দিয়ে দিল। ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে যে ট্রেন ছুটছে তার একখানি কামরার মধ্যে কেমন করে যে চুরুটের ধোঁয়া জমাট বাঁধতে পারে ডাক্তার তা ভেবেই পেল না। তার বিস্ময় জাগলো। ঘরের মধ্যে পাখা ঘুরছে তবু ধোঁয়া জমছে?

হঠাৎ সেই ধোঁয়ার মধ্যে একটা ছায়ামূর্তি ফুটে উঠলো। সব ধোঁয়াটাই বুঝি একটা প্রকাণ্ড মানুষের ছায়া। কামরার ছাদ অবধি একটা ছায়া।

ডাক্তার ভালো করে চোখ দুটি মুছে নেয়, কিন্তু এ তো মিথ্যা নয়। একটা ধোঁয়াটে মানুষ। তার যেন দুটি চোখও রয়েছে। সেই দৃষ্টি পড়েছে তার মুখের উপর। ও কে? কি চায়? ডাক্তার চুপ করে তাকিয়ে থাকে সেই চোখের পানে। চুরুট টানতে সে ভুলে যায়।

সহসা ডাক্তারের কানের কাছে কে যেন বলে—আমার হাতখানি আমাকে ফিরিয়ে দাও।

ডাক্তারের মনে হয় সেই ছায়ার চোখ দুটি যেন অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, জ্বলজ্বল করছে। বুকের মধ্যে থেকে যেন রক্ত শুষে নিতে চাইছে। ডাক্তারের বুকের মধ্যে ধ্বক্ ধ্বক্ করে ওঠে। মনে হয় চোখ ফিরিয়ে নেয়, কিন্তু সেদিক থেকে চোখ ফেরাতে পারে না।

ছায়াটা বুঝি তাকে স্পর্শ করলো। বাঁ হাতের মণিবন্ধে কে যেন খানিকটা বরফ চেপে ধরলো। বাঁ হাতখানি সত্যিই যেন সে চেপে ধরেছে। ডাক্তার হাতখানি টেনে নেবার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। কানের পাশে ফিস্ ফিস্ করে কে যেন বললো—আমার হাতখানি ফিরিয়ে দাও! দিতেই হবে!

ডাক্তার বিহ্বলের মত তাকিয়ে রইল সেই ছায়ার পানে।

কতক্ষণ যে এই ভাবে কেটে যায় ডাক্তার তা জানে না। ইতি-

মধ্যে একটা স্টেশনে এসে গাড়ী থামে। একজন যাত্রী এসে ঘরে ঢোকে। দরজা খুলতেই এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া কামরার ভিতর দিয়ে বয়ে যায়, ডাক্তার সচেতন হয়ে ওঠে। হাতের স্যুটকেসটা বাংকের উপর রেখে, কুলির মাথা থেকে হোল্ড-অল্‌টি নামিয়ে নিয়ে আগন্তুক সামনের বার্থটিতে বসে পড়ে, বলে—আপনার ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম, সেজন্য দুঃখিত।

ডাক্তার মাথাটা একটু দোলায়। কিন্তু মুখে কিছু বলে না। দেখে, বাঁ হাতের মনিবন্ধের উপর দুটি আঙ্গুলের দাগ। তাহলে সত্যই কেউ তার হাতখানি চেপে ধরেছিল নাকি? একটা ছায়া কি করে মানুষের হাত চেপে ধরতে পারে। আঙ্গুলের ছাপই-বা পড়ে কেমন করে? ডাক্তার যুক্তি খোঁজে।

কামরায় আরেকজন সহযাত্রীকে পেয়ে তার মনটা স্বস্তি পায়। বার্থটায় এবার সে শুয়ে পড়ে। আগাগোড়া ঘটনাটি সত্যি, না মনের ভুল সে ভেবে পায় না। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে।

কলিকাতা অবধি আর কোন ঘটনাই ঘটে না। কিন্তু ওই ঘটনার চিন্তাটা সারা মন জুড়ে থাকে। কায়রোর হোটেলে রাত্রির ঘটনাটাও ওর সঙ্গে এসে জোটে। মন থেকে কিছুতেই চিন্তাটাকে তাড়ানো যায় না। মনের মাঝে কোথায় যেন কি একটা ওলোট-পালোট হয়ে গেছে। কায়রোর হোটেল ও ট্রেনের ঘটনাটি যতই অস্বাভাবিক বলে মনে হোক না কেন, মনের উপর সেইটাই যেন পাথরের মত ভারী হয়ে চেপে বসে। সবটাই মনের দুর্বলতা বলে মনে হয় বটে, কিন্তু দুর্বলতাটুকু মুছে দেবার মত সামর্থ্য তার নেই। রাত্রে মাঝে মাঝে সুপ্তি ভেঙ্গে যায়, কিন্তু কেন যে ঘুম ভাঙে ডাক্তার তা বুঝতে পারে না।

হঠাৎ একরাতে ডাক্তারের ঘুম ভেঙ্গে যায়। মনে হয় কে যেন ডাকছে। ডাক্তার চোখ মেলেই দেখে সামনে এক সুন্দরী রমণী দাঁড়িয়ে আছে। রমণী একেবারে খাটের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। একখানি হাত সে তুলে ধরলো ডাক্তারের চোখের সামনে। বাঁ হাত

মণিবন্ধের উপর থেকে কাটা। বললো—দেখছ আমার হাতখানার কি অবস্থা করেছ তুমি। আমার হাতখানি আমাকে ফিরিয়ে দাও।

ডাক্তার স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে।

—দাও না গো, আমার হাতখানি ফিরিয়ে দাও না?

ডাক্তারের ইচ্ছা করে উঠে গিয়ে আলমারী থেকে মমির কাটা হাতখানি বের করে দেয়। বিছানার উপর সে ধড়মড় করে উঠে বসলো। রমণী-মূর্তিটি ঠিক সেই মুহূর্তে চকিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল! নিমেষের মধ্যে ফুটে উঠলো একটা নরকঙ্কাল—বিশ্রী বীভৎস বিভীষিকাময়। তাকানো যায় না, তবু তাকিয়ে থাকতে হয়। কঙ্কাল সহসা ডাক্তারের হাতখানি চেপে ধরলো, বললে—দেবে না?

ডাক্তারের মনে হলো এখনি বুঝি কি যেন একটা ঘটে যাবে।

সহসা বাইরের বারান্দায় আলো জ্বলে উঠলো। ছোট ভাই জানালার সামনে এসে ডাকলো—দাদা! দাদা!

এবার যেন ডাক্তারের আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। বারান্দার আলোটুকু ঘরের মধ্যে এসে পড়া মাত্র দেখা গেল, ঘরের মধ্যে কেউ কোথাও নেই।

ভাই আবার ডাকলো—দাদা।

—কী?

—তুমি অমন গোঁঙাচ্ছিলে কেন? ভয় পেয়েছ বুঝি?

—না। ভয় কিসের?

বিলেত ফেরৎ ডাক্তার ভয় পাবার কথাটা স্বীকার করতে সঙ্কুচিত হয়।

ভাই আর কিছু বলে না, পাশের ঘরে চলে যায়। ডাক্তার কিন্তু বাকি রাতটুকু আর ঘুমুতে পারে না।

পরদিন রাত্রেও ঠিক সেই একই ঘটনা। সেই রমণী মূর্তির আবির্ভাব, পরে মূর্তি রূপান্তরিত হয়ে সেই কঙ্কাল, সেই এক কথা—হাতখানা ফিরিয়ে দিবিনে?

তার পর দিনও ঠিক তাই।

পর পর তিনরাত্রি ভয় ও অনিদ্রায় ডাক্তার অবসন্ন হয়ে পড়লো। ছাত্রজীবনে হাসপাতালে কত মড়া ব্যবচ্ছেদ করেছে কিন্তু এমন ভাবে প্রেতাত্মার মুখোমুখি সাক্ষাৎ কখনও হয়নি। ব্যবহারিক বিজ্ঞান ভূত মানে না। কিন্তু ভূত যদি দিনের পর দিন চোখের সামনে আবির্ভূত হয়, তাহলে তাকে শুধু অবচেতন মনের প্রকাশ বলে তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মমির হাতখানা নিয়ে এসে তো এ এক মহা ঝামেলা হলো, কি করে এই ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ডাক্তার তাই ভাবে।

সে রাত্রে ডাক্তার জেগে রইল। আজ প্রেতাত্মা দেখা দিলেই সে মুখোমুখি কথা বলবে, তৈরী হয়ে বসে রইল সে। টেবিল ল্যাম্পটি জ্বেলে একটা ডিটেকটিভ বই নিয়ে বসল। বইয়ের রহস্য একবার জমে উঠলে আর সহজে ঘুম পাবে না।

কিন্তু নিশ্চিন্ত মনে বেশীক্ষণ পড়া চললো না। রাত বারোটার সময় হঠাৎ টেলিফোন এলো—জানা চেনা পুরানো ঘর বাড়ীর কর্তা হঠাৎ হার্টের গোলযোগে অচেতন হয়ে পড়েছেন, এখনি একবার যাওয়া প্রয়োজন।

ডাক্তার মোটর নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

শীতের রাত। রাস্তা জনশূন্য। ডাক্তার নিজেই মোটর ছুটিয়ে চলেছিল। বালিগঞ্জের ঘুমন্ত পল্লী। সব চুপচাপ। হঠাৎ ডাক্তারের মনে হলো, মোটরের পিছনের সীটে কে যেন বসে আছে। ড্রাইভারের সামনের আরসীখানার উপর তাকিয়েই ডাক্তার চমকে উঠলো। সেই সুন্দরী রমণী। ডাক্তার ভালো করে তাকালো—না, চোখের ভুল নয়। রমণীর কণ্ঠ শোনা গেল—আমার হাতখানা দাও। মণিবন্ধ থেকে কাটা হাতখানি সে বাড়িয়ে দিল ডাক্তারের কাঁধের পাশ দিয়ে। ডাক্তার চমকে উঠলো। শিউরে উঠলো। পরক্ষণেই স্টিয়ারিং হুইল বেঁকে গেল। পথের পাশেই ছিল একখানি খোয়া-পেটা ইঞ্জিন। মোটরখানি এসে পড়লো তার উপর। একটা হুড়মুড় করে শব্দ হোল। তারপরেই সব স্তব্ধ।

আশেপাশের বাড়ীর লোকেরা ঘুম থেকে চমকে উঠলো। দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ালো কেউ কেউ।

হাসপাতালে ডাক্তারের জ্ঞান হলো। দেহের আর কোথাও বিশেষ চোট লাগেনি। শুধু বাঁ হাতের মনিবন্ধে স্টিয়ারিং হুইলের একটা টুকরো ভেঙ্গে বিঁধে গিয়েছিল। সেটা অপারেশন করে বের করে দেওয়া হয়েছে। হাসপাতালের ডাক্তার বললেন—তেমন কিছু নয়। দিন আষ্টেক পরে সেলাইটা কেটে দিলেই চলবে। তবে হাতখানি কিছুদিন কমজোরী হয়ে থাকবে।

পরদিনই ডাক্তার গুপ্ত হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলো।

কিন্তু হাতখানি যত সহজে সেরে যাবার কথা ছিল, তা হলো না। দিন তিনেক পর থেকেই দেখা দিল যন্ত্রণা। পেনিসিলিনেও কোন ফল হলো না। প্রতিদিন গিয়ে এসিস্ট্যাণ্ট ডাক্তারদের দিয়ে তিনি ড্রেসিং করাতে লাগলেন। তবু শেষে হাড়েতেও পূঁজ দেখা দিল। হাতখানি কেটে বাদ দেওয়া ছাড়া তখন আর কোন উপায় রইল না।

হাত কেটে বাদ গেল।

মানসিক অবসাদে কয়েকদিনের মধ্যে ডাক্তার গুপ্ত যেন বুড়ো হয়ে গেলেন। জীবনের সব স্বাদ যেন চলে গেল।

যেদিন তিনি হাসপাতাল থেকে ফিরলেন, সেই রাত্রেই আবার সেই প্রেতাত্মার আবির্ভাব। রাত দুপুরে কি একটা শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে দেখে, জানালা দিয়ে যে চাঁদের আলোটুকু এসে পড়েছে, সেই আলোয় দাঁড়িয়ে আছে সেই রমণী। রমণীর মুখে হাসি। বললো—দিলিনি তো—আমার হাত দিলিনি! তোর নিজের হাতখানিও খোয়ালি। দেখ, এখন আর তোর হাতে আমার হাতে কোন তফাৎ নেই।

রমণী কাটা বাঁ হাতখানি বাড়িয়ে ধরলো ডাক্তারের চোখের সামনে।

ডাক্তার এবার সত্যই আতঙ্কিত হলো, ভয়ে চীৎকার করে উঠলো।

ভাই পাশের ঘর থেকে ছুটে এলো—কি হলো দাদা, কি হয়েছে?

আজ আর ডাক্তার কিছু গোপন করলে না, ধীরে ধীরে ভাইকে সব কথাই বললো।

ভাই বললো,—অমন জিনিষ আর ঘরে রেখে দরকার নেই দাদা, মিউজিয়ামে পাঠিয়ে দাও।

ডাক্তার সেইদিনই মমির হাতখানি মিউজিয়ামে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। সেই রমণী-মূর্তিও আর ডাক্তারকে দেখা দেয়নি।

নতুন বাড়ী

ফাঁকায় বাড়ী খুঁজছিলাম। হঠাৎ সুবিধামত একটা বাড়ী পেয়ে গেলাম। এখনকার দিনে এই ধরনের বাড়ী এত কম ভাড়ায় পাওয়াই দুষ্কর। পাঁচখানি ঘরের ছোট একখানি দোতলা বাড়ী, সামনে তিন-চার কাঠার উপর বাগান। মাত্র পঁচাত্তর টাকা ভাড়ায় কলিকাতার উপকণ্ঠে এমন একখানি বাড়ী পাওয়া আশাতীত বলা চলে।

নতুন বাড়ীতে উঠে এলাম। বাড়ীটি আগেকার দিনের কারও বাগান-বাড়ী ছিল। পুরানো ভিতের পুরানো বাড়ী, তা হোক নতুন করে সারানো হয়েছে, ঘরগুলি বেশ বড়। বড় বড় জানালা দরজা, পুরাতনের রেশ কিছুই নেই। সবচেয়ে মনোরম দোতলার ঘরের সামনের ছাদটুকু। এই ছাদ থেকে যখন সূর্যোদয় চোখে পড়ে আর নীচের সবুজ বাগানটি চোখ স্নিগ্ধ করে তোলে, তখন আমি যে কলিকাতার পাশেই আছি, একথা আর মনে হয় না। মনে হয় আমি যেন কোথাও বাইরে চেঞ্জ করতে এসেছি।

পাড়া প্রতিবেশী বিশেষ নেই। যারা আছে, তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করার কোন ব্যস্ততা আমার ছিল না, কারণ পাড়ার ছেলেদের উপদ্রবেই আমাকে বাড়ী ছেড়ে উঠে আসতে হোল। অনেক দিন সেই পাড়ায় ছিলাম, সেইজন্য অনেক অত্যাচারই সইতে হয়েছিল। সদাই শঙ্কিত থাকতে হতো, সার্বজনীন পূজায় পঁচিশ টাকা চাঁদা দিতে না পারার জন্য যখন তখন বাড়ীর ছাদে ইঁট বৃষ্টি সুরু হয়। এখানে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

সন্ধ্যার পর সামনের ছাদে একখানি ইজিচেয়ার পেতে বসেছিলাম। একাই বসে ছিলাম। অন্ধকারটা বেশ ভাল লাগছিল। এমনভাবে নিরিবিলি উপভোগ করিনি অনেকদিন। বেশ একটা আবেশ এলো, চোখ বুঁজে বসে ছিলাম অনেকক্ষণ।

হঠাৎ কেমন যেন মনে হলো। ঠিক কি যে মনে হলো বলা শক্ত,

তবে কেমন যেন একটা অভূতপূর্ব ভাব সারা দেহ-মনে ছড়িয়েপড়লো। চোখ মেললাম। চোখ চেয়েই দেখি একটা ছায়া। স্পষ্ট একটা মানুষের ছায়া। বছর কুড়ি-বাইশের একটি যুবক। গায়ে গেঞ্জি, পরনে পায়জামা। আমার পানে তাকিয়ে আছে। তার চোখের পানে তাকালে ভয় হয় না, কেমন যেন ছলছলে বিষণ্ণ দুই চোখ।

আমার মুখের পানে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে মুখ ফিরিয়ে নিল, ফিরে তাকালো বাগানের দিকে। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল ছাদের পাঁচিলের দিকে। পাঁচিলের পাশে একবার চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ধীরে ধীরে চলে গেল ঘরের মধ্যে।

আমিও তাড়াতাড়ি উঠে ঘরে এলাম। আলো জ্বাললাম কিন্তু ঘর শূন্য, কেউ কোথাও নেই।

ভাই ডাক্তার। 'কল' সেরে বাড়ী ফিরলো রাত দশটায়। আহারাদি সেরে ভাইকে ছাদে ডেকে একান্তে বসে বললাম সব কথা। অভয়ের মুখে চিন্তার রেখা পড়লো, বললো—এই জন্যই বোধ হয় বাড়ীটার ভাড়া এতো সস্তা। নাহলে কলিকাতার এতো কাছে এমন বাড়ী এতো কম ভাড়ায় পাবার কথা নয়। যাক্, বাড়ীতে তুমি কাউকে যেন কিছু বলো না, দু'-চার দিন আরো দেখা যাক। নাহলে আবার নতুন বাড়ীর চেষ্টা করতে হবে।

দিন সাতেক পরে সকালে চা খেতে খেতে অভয় বললো—কাল তাকে আমি দেখেছি।

—কি রকম, কখন?

ঘরে তো এখনও পাখা লাগানো হয়নি। রাতে বড্ড গরম হচ্ছিল। ঘুম হয় না দেখে, দরজা খুলে ছাদে বেরিয়ে এলাম। ছাদে পায়চারি করতে করতে কি যেন মনে হলো, পাঁচিলের ধারে গিয়ে বাগানের পানে তাকালাম। দেখি, একটা মানুষের ছায়া বাগানের মধ্যে ঘুরছে। গায়ে গেঞ্জি, পরনে পায়জামা। প্রথমে আমার মনে হলো চোর। তাই চুপ করে অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। যখনই গাছের আড়াল থেকে চাঁদের আলোয় গিয়ে পড়ছে অমনি

বুঝতে পারছি যে সেটা একটা ছায়া, আর যখনই গাছের আড়ালে যাচ্ছে তখনই দেখছি সেটা ছায়ার চেয়ে যেন বেশী স্পষ্ট। তোমার কথা তখন মনে হলো, ভাবলাম তোমাকে ডাকি, কিন্তু ফিরে এসে যদি আর দেখতে না পাই। পরীক্ষা করে ব্যাপারটা ভালো করে বুঝে নেবার জন্য একবার সাড়া দেবার ইচ্ছা হলো। খক্ খক্ করে দু'বার কাসলাম। ছায়াটা আমার সাড়া পেয়ে থমকে দাঁড়ালো, মুখ তুলে একবার তাকালো আমার পানে। এতো দূর থেকেও তার চোখ দুটি আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, বড় করুণ, বড় বিষণ্ণ। কয়েক মুহূর্ত সে আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইল, তারপর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মাথা নত করে চলে গেল আম গাছটার নীচে, তারপর আর তাকে দেখতে পেলাম না। মিলিয়ে গেল বোধ হয়।

চুপ করে রইলাম।

অভয় বললো—আমি ভাবছি। এ নাহয় আমরা দেখছি, আমরা ভয় পাচ্ছি না, কিন্তু ছোট ছেলেমেয়েরা দেখলে তো ভয়ে হার্টফেল করবে। এভাবে ভূতের সঙ্গে এক বাড়ীতে তো বাস করা যায় না। কিন্তু এখন যাই-বা কোথায়? এখন তো একটা বাসযোগ্য বাড়ী খুঁজে বের করাও মুস্কিল।

কথাটা আমারও মনে উঠেছে। তবু ভাইকে সাহস দিয়ে বললাম—তবে একটা কথা কি জানিস্। এ ভয় দেখাবার ভূত নয়। তুইও যেমন দেখেছিস, আমিও তেমনি দেখেছি। সাধারণ, বিষণ্ণ, ম্লান। রুক্ষ হিংসাপরায়ণ বলে তো মনে হয় না।

অভয় বললো—ভূতের কি প্রকৃতি তাতো আমরা জানি না। আজ যাকে বিষণ্ণ দেখছি কালই সে হয়তো প্রচণ্ড হয়ে উঠতে পারে। আমাদের আগে থেকেই সাবধান হতে হবে। ছেলেমেয়েদের এখন এখানে এনে দরকার নেই, এখন কিছুদিন যাক।

বর্ধমানে আমাদের একটি বাগান বাড়ী ছিল, গ্রীষ্মের ছুটি হওয়ায় ছেলেমেয়েরা সেখানে গেছে দিন কতক কলিকাতার পরিবেশ থেকে মুক্তি লাভের জন্য, এবং আম জাম কাঁঠাল খেয়ে আসতে। আর

কয়েকদিনের মধ্যেই ইস্কুল কলেজের ছুটি ফুরিয়ে আসবে তখন তো আর তাদের সেখানে থাকা চলবে না। এক সমস্যায় পড়ে গেলাম। শেষে আবার আরেকখানি বাড়ীর সন্ধান করাই মনস্থ করলাম।

রবিবার দিন চা পান করে নতুন কয়েকখানি বাড়ী দেখতে যাবো বলে বেরুচ্ছি, এমন সময় এক বৃদ্ধ এসে হাজির, বললো—আপনিই এই বাড়ীটা ভাড়া নিয়েছেন বুঝি বাবু?

বললাম—হ্যাঁ কেন?

—এই যে সামনের বাগানটা আছে, এই বাগানে কাজ করার জন্য আপনি মালী রাখবেন কি? আমিই এতদিন এখানে কাজ করে আসছি। তবে বাবু বাড়ী ভাড়া দিয়ে চলে গেলেন, বলে গেলেন যে আসবে তাকে বলিস সে-ই রাখবে। তা অনেকদিন তো এ বাড়ীতে ভাড়া আসেনি, আপনারা এসেছেন, আপনাদের কাছেই এলাম।

—মালী রাখবো কিনা আমরা এখনও কিছু ঠিক করিনি।

—আমি এই পাড়ার পুরানো মালী। এদিকে যতগুলি বাসা-বাড়ী দেখেছেন সবেতেই আমি কাজ করি। ত্রিশ-চল্লিশ বছর কাজ করছি। সাফ-সুবরো করি, মাসকাবারি একটা বরাদ্দ আছে, কেউ দশ, কেউ বা পনেরো, কেউ বা বিশ। যার যেমন বাগান। আপনাদের এই বাগান থেকে আমি দশ টাকা করে পেতাম। আপনারা না হয় তাই দেবেন।

হঠাৎ মনে হলো এর কাছ থেকে আগের বাসিন্দার পরিচয়টা একটু নিলে তো হয়। বললাম—এ বাড়ীতে আগে তো হরিচরণ বাবু ছিলেন। তাঁর কে কে ছিলেন এখানে?

—বাড়ী হরিচরণ বাবুর তো নয়। বাড়ী ছিল হরি বাবুর দাদার। জাহাজী কারবার করে অনেক পয়সা তিনি কামিয়েছিলেন। শিববাবু পয়সা যেমন করেছিলেন দিলও ছিল সেই রকম। কখনও কোন মানুষ দরজা থেকে ফিরে যায়নি। কিন্তু বেচারার দুর্ভাগ্য, একটা ছেলে, তা বউ মারা যাবার পর থেকে ছেলেটা পাগল হয়ে গেল। তাইতেই শিববাবুর মন ভেঙে গেল, দু'বছরের মধ্যে তিনিও মারা

গেলেন। পাগলা ছেলে কাকার কাছেই রইল। কাকাও কত চেষ্টা করলেন কিন্তু পাগলকে সারাতে পারলেন না। শেষে কোথায় যেন পাগলা-আশ্রম আছে সেখানে ছেলেটাকে পাঠালেন। পরে শুনলাম ছেলেটা সেখানে মারা গেছে।

—শিববাবুর বিষয়-সম্পত্তি সব কি হলো?

—সব ওই ছোট ভাইই পেল। হরিবাবু ওই ভাইপোটাকে বড় ভালবাসতো। বললে—দেখ, মধু, এ বাড়ীতে আমার আর মন টেকছে না, আমি কাশীবাসী হবো। একটা ভাইপো তা-ও আমার কপালে বাঁচলো না। তারপরেই তিনি কাশী চলে গেলেন। বাড়ী কত দিন খালি পড়েছিল, এই প্রথম ভাড়াটে এলেন আপনারা।

—হরি বাবুর ছেলেমেয়ে ছিল না?

—তিনি তো বিয়ে-থা-ই করেন নি। বংশটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেল বাবু।

মধু মালীকে বিদায় দিলাম। কিন্তু মধুর কথাগুলো মনে একটা খট্‌কা বাধিয়ে দিল।

সেই দিন রাত্রে ছাদে বসে অভয়ের সঙ্গে হরিবাবুর প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছি। বড় আমগাছটার ছায়া এসে পড়েছে ছাদের উপর। চাঁদ পড়েছে গাছের আড়ালে। সমস্ত ছাদটাই অন্ধকার। সহসা দেখি সেই ছায়ায় ছাদের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে সেই ছায়া। তাকিয়ে আছে আমাদের মুখের পানে। সেই গেঞ্জি ও পায়জামা। করুণ বিষণ্ণ দুই চোখের দৃষ্টি। আমরা দু'জনে তার মুখের পানে চোখ তুলে তাকালাম।

এবার সেই ছায়া বরাবর ছাদ দিয়ে সামনের ঘরের দ্বারে গিয়ে দাঁড়ালো।

—চল, তো দেখি কোথায় যায়—বলে আমরা দু'জনেই উঠে পড়ে তার অনুসরণ করলাম।

এবার ছায়া আর মিলালো না। বরাবর ঘর পার হয়ে সিঁড়ির

মুখে এসে দাঁড়ালো। পিছন ফিরে একবার তাকালো আমাদের পানে। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামতে সুরু করলো।

সিঁড়ি পার হয়ে সামনের বৈঠকখানা অতিক্রম করে আমরা বাগানে এসে পড়লাম। বাগানে এসে আবার সে ফিরে তাকালো আমাদের পানে। বিষণ্ণ দুই চোখে ভয় দেখানোর কোন চেষ্টা নেই। আমরা পিছনে যাচ্ছি দেখে সে আবার অগ্রসর হলো। তার এবারকার পদক্ষেপ অতি মন্থর। অতি ধীর। ছায়া বরাবর এলো সেই আমগাছের নীচে। গাছের নীচে অন্ধকার। সেই অন্ধকারে সে একবার ফিরে দাঁড়ালো। বেশ ভালো করে তাকালো আমাদের পানে। আমরা থমকে দাঁড়ালাম। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে বেশ কিছুক্ষণ সে তাকিয়ে রইল। তারপরেই সহসা মিশে গেল বাতাসে।

অভয় বললো—রহস্যময় ব্যাপার! ভূতে ভয় দেখায় না, এমন ভূত তো আজ অবধি কারও মুখে শুনিনি, বইয়ে পড়িনি।

বললাম—এ ভয় দেখানোর ভূত নয়, এ যেন আমাদের এইখানে ডেকে নিয়ে এলো।

—ব্যাপারটা দেখে তাই মনে হয় বটে। ছাদ থেকে বরাবর এই আমগাছের নীচে আমাদের ডেকে আনার অর্থ কি?

—অর্থ নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে। এই আম গাছটির সঙ্গে ওই প্রেতাত্মার নিশ্চয়ই কোন একটা যোগ আছে। সেটা কি কাল জানতে হবে।

সারা রাত ঘুমাতে পারলাম না, যখন তখন ছম্ ছম্ করে ঘুমটা ভেঙে যায়।

সকাল হতেই গেলাম মধু মালীর খোঁজে।

বাগানে কাজ করা সম্পর্কে দু'চারটে আজে বাজে কথা বলে বললাম—হাঁরে, হরিবাবুর ছেলে কোথায় মারা গিয়েছিল রে?

—সে তো বাবু সেই পাগলের হাসপাতালে, সে তো আর বাড়ী ফেরেনি।

—মনে হয় তাকে বোধ হয় আমি দেখেছি, কতদিনের কথা বলতো ?

—এই তো বাবু বছর তিনেক হবে। খোকাবাবু মারা যাবার পর বাবু কিছুদিন ছিলেন এখানে। তারপর বললেন বাড়ী বিক্রী করে দেবো, বাড়ীখানি খালি রেখে দিলেন প্রায় এক বছর, তারপর কি ভেবে আবার বাড়ী সারাতে সুরু করলেন, তার কতদিন পরে আপনারা এলেন।

—আচ্ছা, খোকাবাবুর চেহারা কেমন ছিল বলত, রোগা একহারা চেহারা, মাথার চুলগুলো ছোটো ছোটো করে ছাঁটা, পায়জামা আর গেঞ্জি পরে এই বাগানে পায়চারি করতো, না ?

—আপনার তো মনে আছে বাবু, ঠিক তাই। আপনার বুঝি আগে যাওয়া আসা ছিল এই বাড়ীতে ?

সেই কথার কোন জবাব না দিয়ে, বললাম—আমাকে একটা মজুর ডেকে দাও তো, দু-একটা জায়গা একটু ঠিক-ঠাক করতে হবে।

—যদি সাধারণ কাজ হয় তো বলুন, আমার ছেলেটাকেই বলে দিই, সেই সব কাজ করে দেবে।

—তাই দাও, আমার এখনি দরকার।

মধুর ছেলে এলো, বললাম—এই আমগাছের গোড়াটা খুঁড়ে ফেলতো। বরাবর গর্ত করবি। এই বেদীটা ভেঙে ফেল।

আমগাছের একপাশে একটা বেদী গাঁথা ছিল। সিমেণ্টের বেদী, অবসর সময়ে বসবার জন্য। সে বেদী ভেঙে দেওয়া হলো। তারপর সুরু হলো তার নীচে গর্ত খোঁড়া। হাতখানেকও খুঁড়তে হলো না, ছেলেটা আর্তনাদ করে উঠলো, বললো—বাবু, এর নীচে মানুষ যে!

সত্যই গর্তের একপাশে একটা কংকালের খানিকটা বেরিয়ে পড়েছে। বললাম—থাক, আর খুঁড়তে হবে না, চট্ করে একবার থানায় যা দিকি, একেবারে পুলিশ নিয়ে আসবি।

তারপর ঘটনা সংক্ষিপ্ত। পুলিশের সামনে মাটির নীচে থেকে সেই কংকাল বেরুলো। শিববাবু ছিলেন দার্জিলিং-এ, পুলিশ গিয়ে

ধরলো তাকে। কোন্ উন্মাদ আশ্রমে তার ভাইপো মারা গেছে তার সার্টিফিকেট চাইল। শিববাবু যা কিছু বললেন সবই এলোমেলো, অসংলগ্ন, পুলিশ শিববাবুকে গ্রেপ্তার করলো।

কয়েকদিন হাজতবাসের পর শিববাবু স্বীকার করলো, সম্পত্তির লোভে ভ্রাতুষ্পুত্রকে সে বিষ খাইয়ে হত্যা করে এবং গোপনে ওই আম গাছের নীচে তাকে পুঁতে ফেলে। পাড়ায় রটিয়ে দেয় ভাইপোকে উন্মাদ আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়েছে।

শিববাবুর ফাঁসির হুকুম হলো।

তারপর আর কখনো সেই বাড়ীতে আর ছায়া মূর্তি দেখা যায়নি। এই ঘটনার পর পাঁচ বছর কেটে গেছে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে নির্বিবাদে আমরা এখানে বাস করছি।

Collect More Books >
From Here